ঈমান-ইসলামের মূলভিত্তি ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস

[বাংলা - bengali - البنغالية]

মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ

অনুবাদ : ইঞ্জিনিয়ার মুজীবুর রহামন

সম্পাদানা : আব্দুল্লাহ শহীদ আ: রহমান

2011 - 1432

﴿ أركان الإسلام والعقيدة الإسلامية ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد بن جميل زينو

ترجمة: المهندس مجيب الرحمن

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

2011 - 1432

IslamHouse.com

সূচী পত্র
ঈমান ইসলামের মূলভিত্তি

প্রথম অধ্যায়

﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ﴾ الفاتحة: ١

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও ঈমানের অর্থ । কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর তাৎপর্য

ইসলামের ভিত্তিসমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটিঃ

১। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ এর সাক্ষ্য দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের অর্থে কোন উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ সমস্ত কথা ও কাজের উপর 'আমল করা ওয়াজিব যা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছিয়েছেন।

২। সালাত কায়েম করাঃ এর মধ্যে আছে উহার রোকন ও ওয়জিবসমূহ পুরোপুরি আদায় করা এবং সালাতের মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভয়) বজায় রাখা।

৩। যাকাত প্রদান করাঃ যখন কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম পরিমাণ সোনা অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য বা ঐ পরিমাণ অর্থের মালিক হয় তখন তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। প্রত্যেক বৎসরের শেষে সে যাকাত হিসাবে শতকরা ২.৫০%
(চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) হারে আদায় করবে। নগদ টাকা ব্যতিত অন্যান্য জিনিসের যাকাত আদায়ের নির্দিষ্ট হিসাব আছে।

৪। বাইতুল্লাহতে হজ আদায় করাঃ যার সামর্থ আছে উহা তার উপরে ফরজ।

৫। রমজানে সিয়াম পালন করাঃ উহা হল খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য যে সব কারণে সিয়াম (রোজা) ভঙ্গ হয় উহা হতে সিয়ামের (রোজার) নিয়তে ফজর হতে মাগরিব পর্যন্ত বিরত থাকা।   (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)

ঈমানের ভিত্তিসমূহ

১। আল্লাহপাকের উপর ঈমান আনাঃ এতে অন্তর্ভুক্তআছে তাঁর অস্তিত্বে ও একত্ববাদে বিশ্বাস করা। তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস করা সকল প্রকার ইবাদত তাঁরই প্রাপ্য।

২। তাঁর ফেরেশ্তাদের (মালাইকাদের) উপর ঈমান আনাঃ তারা হচ্ছেন নূরের তৈরী। তাদেও সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহপাকের হুকুমসমূহকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য।

৩। তাঁর কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনাঃ উহাদের মধ্যে আছে তাওরাত, ইন্জিল,

যাবুর, কোরআন।   তন্মধ্যে কোরআন পাক সর্বোত্তম।
৪। তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনাঃ তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৫। আখিরাতের উপর ঈমান আনাঃ উহা হচ্ছে হিসাব নিকাশের দিন। যেদিন মানুষের 'আমলসমূহের বিচার হবে।
৬। তকদীর বা ভগ্যের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনাঃ তার মধ্যে আছে আসবাব বা উপকরণ ব্যবহার করা, আর ভাগ্যের ভাল, মন্দ যাই ঘটুক না কেন তাতে রাজী থাকা, কারণ উহা আল্লাহ হতে প্রদত্ত।   (বর্ণনায় মুসলিম)

ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের অর্থ

ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁর পোশাক ছিল ধবধবে সাদা আর চুল ছিল কুচকুচে কালো। দূর হতে ভ্রমণ করে আসার কোন লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না, অথচ তিনি আমাদের পরিচিতও ছিলেন না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটবর্তী হলেন, তাঁর হাঁটুতে হাঁটু লাগালেন এবং তাঁর দু'হাতের তালু নিজের উরুর উপর রেখে বসলেন। তারপর বললেনঃ হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।
উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ইসলাম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানে সিয়াম পালন করা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ করা। উত্তর শুনে তিনি বললেনঃ সত্য বলেছেন। আমরা অবাক হয়ে গেলাম-প্রশ্ন ও তিনি করছেন, আবার তিনিই উত্তরকে সত্য বলে মানছেন।
তিনি আবার বললেনঃ এখন আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ উহা হচ্ছে আল্লাহপাকের উপর, তাঁর ফেরেশ্তাদের (মালাইকাদের) উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর এবং আখিরাতের উপর এবং ক্বদরের ভাল মন্দের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। উত্তর শুনে উনি বললেনঃ সত্য বলেছেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেনঃ এখন আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তাঁকে

নাও দেখ, তিনিতো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। তারপর তিনি বললেনঃ আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ প্রশ্নকারী হতে জবাব দানকারী এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নয়। তারপর তিনি বললেনঃ তবে আমাকে তার আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। এরপর আগন্তুক চলে গেলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আমাকে প্রশ্ন করলেনঃ হে উমার ! তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে? উত্তরে বললামঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেনঃ ইনি ছিলেন জিবরীল। তিনি তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। (বর্ণনায় মুসলিম)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। এই কালেমার মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের উপাসনা, আরাধনা অস্বীকার করা হয় এবং আল্লাহই যে সত্যিকারের মা'বুদ তা স্বীকার করা হয়।

১। আল্লাহ পাক বলেন

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ١٩ ﴾ محمد: ١٩

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। (সূরা মুহাম্মদ, ১৯)

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة (صحيح البزار)

যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে (বর্ণনায় সহিহ বাজ্জার)।

মুখলিস কে ?

যিনি কালেমার অর্থ বুঝেন, তার উপর আমল করেন এবং সর্বপ্রথমে কালেমার দাওয়াত দেন আর্এ সকল কিছু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেন তিনিই মুখলেস। কারণ এর ভিতরে ঐ তাওহীদ রয়েছে যার জন্য আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবূ তালিবের যখন মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন তাকে দাওয়াত দিয়ে বলেনঃ (হে আমার চাচা ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, উহা বললে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য আবেদন করতে

পারব। কিন্তু তিনি কালেমা বলতে অস্বীকার করলেন । (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)
৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে ১৩ বছর যাবত মুশরিকদের এই দাওয়াত দিয়েছেন যে, তোমরা বল, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই। তারা উত্তরে যা বলত সে সম্পর্কে কোরআন পাকে আল্লাহ্ তেআলা বলেনঃ

﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْۖ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْـَٔاخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ ﴿٧﴾ ﴾ ص: ٤ - ٧

এবং যখন তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে ভয় প্রদর্শক আসলেন তখন তারা অবাক হয়ে গেল এবং কাফিররা বললঃ ইনি তো যাদুকর ও মিথ্যাবাদী। সে কি আমাদের সমস্ত মা‘বুদকে এক মা‘বুদ বানাতে চায়। ইহাতো বড়ই অবাক হওয়ার কথা। তখন তাদের নেতারা তাদেরকে ঘুরে ঘুরে বুঝালঃ তোমরা তোমাদের মা‘বুদ নিয়েই চলতে থাক, তাতে যত সবরই করতে হোক না কেন। এটাই চাওয়া হচ্ছে। আমরা তো আগের জামানার লোকদের নিকট এটাকখনও শুনিনি। বরঞ্চ এটা বানানো কথা। (সূরা ছোয়াদ আয়াত ৪-৭)
কারণ আরবরা কালেমার অর্থ বুঝেছিল। যে ব্যক্তি উহা মুখে উচ্চারণ করবে কিংবা স্বীকার করবে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু‘আ করতে পারবে না। ফলে তাদের বেশীর ভাগই কালেমা পড়তে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহপাক তাদের তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ ﴾ الصافات: ٣٥ - ٣٧

যখন তাদের বলা হত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখনই তারা অহংকার করত আর বলতঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা‘বুদদের পরিত্যাগ
করব? কিন্তু তিনি সত্য নিয়ে এসেছিলেন এবং পূর্বের নবীদের ও সত্য বলে মেনে ছিলেন। (সূরা সাফফাত ৩৫-৩৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على

الله عزوجل (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদের ইবাদত করাকে অস্বীকার করে তার সম্পদ, রক্ত অন্যের জন্য হারাম আর তার হিসাব নিপতিত হয় আল্লাহ পাকের উপর। (বর্ণনায় মুসলিম)

এই হাদিসের অর্থঃ যখনই কেউ কালেমা পড়বে তখনই তার উপর জরুরী হয়ে যাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত, উপাসনা অস্বীকার করা ও তার বিরুদ্ধাচরণ করা। যেমন মৃতদের নিকট দু'আকরা বা এই জাতীয় অন্যান্য ইবাদত। সত্যিই অবাক লাগে, কোন কোন মুসলিম এই কালেমা পড়ে, কিন্তু তাদের কাজে কর্মে এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনকি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট দু'আ ও করে।

৫। কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাহল্লাহ) হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও ইসলামের ভিত্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়, যাতে আছে সমস্ত ধরণের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে। কারণ, যখন কোন মুসলিম আল্লাহর সামনে নিজেকে অবনত করবে, একমাত্র তাঁর নিকট দু'আ করবে এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করবেব তখনই তার জীবন পূর্ণভাবে আল্লাহ প্রদত্ত হবে।

৬। ইবনে রজব (রঃ) বলেনঃ ইলাহ হচ্ছেন ঐ সত্বা যার আনুগত্য করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না তাঁর প্রতি ভয়ে ও সম্ভ্রমে। তাঁর প্রতি থাকবে ভালবাসা, ভয় ও আশা। তাঁর উপর ভরসা করে তাঁর নিকট অনুকম্পা চাওয়া হয় দু'আ করে। এগুলো দেবার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ পাকের। একমাত্র মা'বুদের জন্যই প্রযোজ্য উপরোক্ত ইবাদতসমূহ। কোন সৃষ্টিকে শরীক করলে কালেমার মধ্যে যে ইখলাস থাকার কথা তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা মাখলুকের ইবাদত হিসাবে শামিল হয়।

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه (رواه مسلم)

মৃতুর সময় তোমরা মৃত্যুপথ যাত্রীদের কালেমার তালকীন (বারে বারে পড়া) দাও। কারণ, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) সে, একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবেই, এর পূর্বে তার যত শাস্তিই হোক না কেন। (বর্ণনায় সহিহ ইবনে হিব্বান)

তালকীন শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ার নাম নয়, বরঞ্চ অন্যেরা যদি কোন বদ ধারণা করে তার বিরুদ্ধাচরণ করাও এতে শামীল। এর দলীল হচ্ছে আনাস

ইবনে মালেক (রাঃ) এর হাদিসঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক আনসারী সাহাবির রোগ দেখতে যান। তাঁকে বললেনঃ হে মামা! বলঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেনঃ মামা না চাচা? উত্তরে রাসূল বললেন বরং মামা। তিনি বললেনঃ তবেতো আমার জন্য উত্তম হচ্ছে কালেমা পড়া। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হাঁ, অবশ্যই। (বর্ণনায় সহিহ, মসনদে আহমদ)
৮। কালেমা

لاإله إلا الله

তার পাঠককে উপকারর দেয় যদি সে উহা তার জীবনে প্রতিফলিত করে। আর কোন শিরকী কাজ না করে, যা কালেমার বিরুদ্ধাচরণ বলে গণ্য। যেমনঃ মৃত কোন ব্যক্তি অথবা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট দু'আ করা। এটা হচ্ছে অযুর ন্যায়, যা অযু ভঙ্গের যে কোন কারণ ঘটলে নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি কালেমা ভঙ্গের কোন কারণ ঘটলে কালেমা নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে উহা তাকে একদিন না একদিন সমস্ত ধরণের শাস্তি (জাহান্নামের) হতে উদ্ধার করবে। (বর্ণনায় সহিহ বায়হাকি)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যের অর্থ

এই ঈমান পোষণ করা যে তিনি অবশ্যই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত, অতএব তাঁর সমস্ত কথাকে সত্য বলে স্বীকার করা আর তিনি যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা। যে কথা বা কাজ করতে নিষেধ করেছেন বা ধমকি দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত সে ভাবেই করব যেভাবে তিনি করতে বলেছেন।

১। শায়খ আবুল হাসান আন-নদভী তার "নবুওয়ত"গ্রন্থে বলেনঃ প্রত্যেক যামানায় ও এলাকায় সমস্ত নবী (আলাই হিমুস্সালম) দের প্রথম দাওয়াত আর সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আক্বীদা সহীহ করা। সাথে সাথে বান্দা ও তার রবের মধ্যের সম্পর্ক সহীহ করা। আর ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেয়া, এক আল্লাহর ইবাদত করা। কারণ, ভাল ও মন্দ করার অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতএব, ইবাদত পাওয়ার হকদার তিনিই। দু'আ, বিপদে আশ্রয়, পশু যবেহ ইত্যাদি সবই তারই জন্য হতে হবে। প্রত্যেকেই তাদের যামানায় যে ধরনের পৌত্তলিকতা ও শিরক প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতেন। এর মধ্যে থাকত কোন মূর্তি, গাছ বা পাথরের পুজা। আর তাদের যামানায়

উত্তম ও নেককার লোক, চাই সে মৃতই হোন বা জীবিত, তাদের ইবদত করা হতে বিরত রাখতেন।
আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আল্লাহ রাববুল ইজ্জত বলেনঃ

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ الأعراف: ١٨٨

হে নবী! আপনি বলুন, আমি আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতার অধিকারী পর্যন্ত নই। একমাত্র আল্লাহ তাআলা যা চান তাই হবে। যদি আমি গায়েব জানতাম, তাহলে বেশী বেশী ভাল কাজ করতাম, আর খারাবী কখনো আমাকে স্পর্শ করতো না। বরং, আমি হলাম যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা। (সূরা ‘আ’রাফ ১৮৮)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لاتطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله (رواه البخاري)

তোমরা আমার প্রশংসার ক্ষেত্রে ঐ রকম সীমা অতিক্রম কর না, যেমন খৃষ্টানেরা ঈসা ইবনে মরিয়ম এর ক্ষেত্রে করেছে। আমি আল্লহর বান্দা। তাই বলবে আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।
(বর্ণনায় বুখারী)
আরবীতে “এতরা” হচ্ছে প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা। আমরা কখনই আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের কাছে দু‘আ করব না, যেমন নাসারারা ঈসা ইবনে মরিয়ম এর ক্ষেত্রে করেছে। ফলে তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। তাই তিনি আমাদের শিখিয়েছেন তাকে আবদুল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলতে।
৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বত-এ মধ্যে শামিল হচ্ছে এক আল্লাহর নিকট দু‘আর ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা এবং কোন অবস্থতেই অন্যের নিকট দু‘আ না করা, যদিও সে ব্যক্তি কোন নবী, রাসূল বা অলীই হোন না কেন।
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله (رواه الترمذي)

যখন কোন কিছু চাও একমাএ আল্লাহর নিকটেই চাও, আর যখন বিপদে সাহায্য চাও তখনও আমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাও। (বর্ণনায় সহীহ তিরমিযি)

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোন দুঃখ পেরেশানী অবতীর্ণ হত তখন তিনি বলতেনঃ

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث (رواه الترمذي وقال حديث حسن)

হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার দয়ার অসিলায় সাহায্য চাচ্ছি। (বর্ণনায় তিরমিযি, হাসান)

তাই কবি যর্থাথই বলেছেনঃ

لو كان حبك صادقا لأطعته - لأن المحب لمن يحب مطيع

যদি তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা সত্য হত তবে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতে। কারণ, মহব্বতকারী যাকে মহব্বত করে তাকে মান্যও করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সত্যিকারের মহব্বতের মধ্যে এটাও আছে যে, সে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়াকে ভালবাসবে। কারণ তিনি সর্বপ্রথম উহার প্রতিই দাওয়াত দেন। আর যারা তাওহীদের দিকে মানুষদের ডাকে তাদের ও ভালবাসবে। সাথে সাথে শিরক এবং উহার দিকে যারা ডাকে তাদের অপছন্দ করবে।

আল্লাহ তাআলা কোথায় ?

মা'য়াবিয়া ইবনুল হাকাম আসসুলামী রা. বলেনঃ আমার একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে আমার বকরীসমূহ অহুদ ও জোয়ানিয়া পাহাড়র নিকটবর্তী এলাকায় চড়াত। একদিন সে এসে বলল যে, একটা নেকড়ে এসে একটা ছাগল নিয়ে গেছে। যেহেতু আমি একজন মানুষ এবং যে যে কারণে মানুষ রাগান্বিত হয় আমিও তা থেকে মুক্ত নই, তাই রাগে তাকে একটা চড় দিয়ে বসি। তারপর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলাম। কিন্তু ঐ ঘটনা আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে মুক্ত করে দেব? তিনি বললেনঃ তাকে আমার নিকট উপস্থিত কর? তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলত আল্লহ কোথায়? সে উত্তরে বললঃ আসমানে। তারপর তিনি বললেনঃ বলত আমি কে? সে বললঃ আপনি আল্লাহ্ তাআলার রাসূল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে মুমিন। (বর্ণনায় মুসলিম আবু দাউদ)

হাদিসটির শিক্ষা

১। সাহাবায়ে কেরাম তাদের যে কোন অসুবিধাতেই, তা যতই ছোট হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপস্থিত হতেন, ঐ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কি নির্দেশ তা জানতে চাইতেন।

২। দ্বীনের যে কোন ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মত বিচার করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾ النساء: ٦٥

না, কখনো নয়, আপনার রবের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে মতভেদ ঘটেছে তার বিচারের ভার আপনার উপর না দেয়, তারপর আপনি যে বিচার করে দেন তাতে কোন মনঃকষ্ট না পায়। বরং তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নেয়। (সূরা নিসা, ৬৫)

৩। সাহাবী যিনি তার দাসীকে মেরেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আচরণকে অন্যায় হিসাবে গ্রহণ করে তার দাসীকেই মর্যাদা দিলেন।

৪। কখনও ক্রীতদাস মুক্ত করতে হলে শুধুমাত্র মুমিনদের মুক্ত করতে হবে, কাফেরদের নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। যখন বুঝলেন যে, তিনি ঈমানদার তখন তাকে মুক্ত করতে বললেন। যদি সে কাফের হত তবে তাকে মুক্ত করতে হুকুম দিতেন না।

৫। আল্লাহপাকের একত্ববাদ সমন্ধে প্রশ্ন করা ওয়াজেব। তার মধ্যে, আল্লাহ তাআলা যে আরশের উপর এটা গুরুত্বপূর্ণ। আর এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ওয়াজিব।

৬। আল্লহ কোথায়? এই প্রশ্ন করা শরীয়ত সম্মত ও সুন্নত। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা করেছিলেন।

৭। আল্লাহ তাআলা আসমানের উপর আছেন এ রকম দেয়াও শরিয়ত সম্মত। কারণ এই উত্তরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এর সমর্থনে বলেঃ

﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴿١٦﴾ ﴾ الملك: ١٦

তোমরা কি তাঁর ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছ যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন না। (সূরা আল-মুলক, ১৬)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আর আসমানে আছেন- এর অর্থআসমানের উপরে আছেন।

৮। ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে সাথে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর রাসূল তার সাক্ষ্য দেয়া হবে।
৯। আল্লাহ তাআলা যে আসমানের উপর, এই সাক্ষ্য দেয়াটা ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দেয়। আর এই সাক্ষ্য দেয়া প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য ওয়াজিব।
১০। যারা বলে যে আল্লাহ কাআলা সশরীরে সর্বত্র বিরাজমান তাদে এই মত খন্ডণ করছে এই হাদিস। সত্য হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলমের দ্বারা সর্বত্র ও সর্ব সময়ে আমাদের সাথে আছেন।
১১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ক্রীতদাসীকে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাসী ঈমানদার ছিল কিনা এটা তিনি জানতেন না এবং উহা দ্বারা ঐ সমস্ত সুফীদের কথাকে খন্ডন করা হয়েছে যারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন।

সালাতের ফজিলত ও উহা পরিত্যাগকারী পরিণাম

১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ فِي جَنَّٰتٖ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ المعارج: ٣٤ - ٣٥

এবং যারা তাদের সালাতসমূহকে হেফাজত করে তারাতো জান্নাতে সম্মানের আসন পাবে। (সূরা আল-মায়াজিয ৩৪-৩৫)

২। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِۗ ﴿٤٥﴾ ﴾ العنكبوت: ٤٥

এবং সালাত কায়েম কর, নিশ্চয়ই সালাত সমস্ত ধরণের মন্দ ও গর্হিত কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে। (সূরা আল- আনকাবুত ৪৫)

৩। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿ فَوَيْلٞ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ﴾ الماعون: ٤ - ٥

ঐ সমস্ত সালাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী। (সূরা আল-মা‘উন ৪-৫)
অর্থাৎ উহা হতে গাফেল এবং নির্দিষ্ট সময়ে উহা আদায় করে না, অথবা অযথা দেরী করে আদায় করে)

৪। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ ﴾ المؤمنون: ١ - ٢

নিশ্চয়ই ঐ মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে যারা তাদের সালাতের মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভয়) অবলম্বন করে। (সূরা আল মুমিনুন ১-২)
৫। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ ﴾ مريم: ٥٩

তারপর তাদের পরে পরবর্তীগণ আসলো যারা সালাতসমূহকে নষ্ট করল এবং নিজেদের খেয়াল খুশীমত (কুপ্রবৃত্তি অনুযায়ী) চলতে শুরু করল, শীঘ্রই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা মারইয়াম, ৫৯)
৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أرئيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا (متفق عليه)

তোমরা বলোতো যদি কারো বাড়ীর দরজার নিকট কোন নহর (নদী) প্রবাহিত হতে থাকে, আর তাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেনঃ না, কখনো কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। উত্তরে তিনি বললেনঃ এই রকমই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহসমূহকে দূরীভুত করেন। (বর্ণনায় বুখারিও মুসলিম)
৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر(صحيح رواه احمد وغيره)

তাদের (কাফেরদের) সাথে আমাদের পার্থক্য হল সালাত। যে তাকে পরিত্যাগ করল সে যেন কাফির হয়ে গেল। (বর্ণনায় সহিহ আহমদ)
৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (رواه مسلم)

কোন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হল সালাকে পরিত্যাগ করা। (বর্ণনায় মুসলিম)
ওযু ও সালাত শিক্ষা
ওযুঃ বিসমিল্লাহ্ বলে প্রথমে দুই জামার হাতা কুনুই পর্যন্ত গুটান, এরপর-

১। তিনবার করে দুই হাতের কব্জী পর্যন্ত ধৌত করুন প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত তারপর তিনবার করে কুলি করুন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া দিন।
২। তারপর তিন বার করে মুখমন্ডল ধৌত করুন।
৩। তিনবার করে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত।
৪। তারপর সম্পূর্ণ মাথাকে দুকানসহ মসেহ করুন।
৫। তারপ ৩ বার করে দুই পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করুন। পথমে ডান পা, পরে বাম পা।

ফজরের সালাত

সকালের (ফজরের) সালাতে ফরজ হচ্ছে দুই রাকা'আত। নিয়ত করতে হবে মনে মনে।

১। প্রথমে ক্বিবলার দিকে মুখ করতে হবে। তারপর হস্তদ্বয়কে কান পর্যন্ত উঠায়ে বলতে হবে "আল্লাহু আকবার"
২। তারপর বুকের উপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপন করতে হবে। তারপর পড়ুন

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়াতা আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা"। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি প্রশংসার সাথে সাথে। আপনার নাম অত্যন্ত বরকতময়, আপনার সম্মান অতি উচ্চ এবং আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। (ইহা ছাড়া সহীহ সুন্নতে আরো যে যে দু'আ আছে তার যে কোন একটা পড়া যায়)।

তারপর প্রথম রাক'আতে

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ﴾ الفاتحة: ١

আউজুবিল্লাহি মিনাশ্শায়তানের রজীম,
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, মনে মনে পড়তে হবে।
তারপর সূরা ফাতেহাঃ

قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧ ﴾ **الفاتحة: ١ - ٧**

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বীল আলামিন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়া কানা'বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তা'ইন। ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাক্বীম, সিরাতল্লাযিনা আন্'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বোয়াল্লীন। আমীন!

তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির বাহীম বলে যে কোন একটা সূরা পড়তে হবে।

১। তারপর আল্লহু আকবর বলে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঁচু করে রুকুতে যেতে হবে এবং হাতের তালু দিয়ে দুই হাটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। তারপর বলতে হবে

سبحان ربي العظيم

"সুবহান রাবিবয়াল আজীম" (অর্থাৎ আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) কমপক্ষে ৩ বার।

২। তারপর সোজা হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে বলতে হবে

سمع الله لمن حمده اللّٰهُمَّ ربنا لك الحمد

"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"।

যে কেউ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তিনি তা শুনতে পান। (হে আল্লাহ, হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই প্রাপ্য)।

৩। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদাতে যেতে হবে। সিজদাতে দু'হাতের পাতা, হাটুদ্বয়, কপাল, নাক ও দু'পায়ের আঙ্গলসমূহ কেবলামুখী হয়ে মাটিতে থাকবে, তবে কনুইদ্বয় মাটি স্পর্শ করবে না। তারপর বলুন :

سبحان ربي الأعلى

"সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা" ৩ বার অর্থাৎ (আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)

৪। তারপর আল্লাহু আকবার বলে প্রথম সিজদা হতে মাথা তুলুন এবং হাতের তালু হাটুর উপর রাখুন। তারপর বলুন-

رب اغفرلى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى

"রাব্বিগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আফীনী ওয়ারযুকনী" অর্থাৎ হে আমার

রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর দয়া বর্ষণ করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমাকে দোষ মুক্ত করুণ এবং উত্তম রিযিক দান করুন।
৫। তারপর একইভাবে দ্বিতীয় সিজদা করুন এবং বলুন :

سبحان ربي الأعلى

"সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা" তিনবার।
৬। তারপর দ্বিতীয় সিজদা হতে আল্লাহু আকবার বলে দাড়ান।
দ্বিতীয় রাকা'আত
১। তারপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ুন। তার সাথে যে কোন সূরা মিলান অথবা কিছু আয়াত তিলাওয়াত করুন।
২। তারপর প্রথম রাক'আতের অনুরূপ রুকু সিজদা করুন। দ্বিতীয় সিজদার পরে আত্তাহিয়াতু পড়তে বসুন। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করুন এবং তর্জনীকে উঠিয়ে নাড়াতে থাকুন এবং পড়ুনঃ

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللّٰهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

সমস্ত শুভ সম্ভাষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সমস্ত সালাত ও উত্তম জিনিসও তাঁরই। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ তাআলার সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও আল্লাহ তাআলার শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দাও প্রেরিত পুরুষ।
হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের উপর সালাত বর্ষণ করুন যেমনি ভাবে ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর

সালাত (ক্ষমা) বর্ষণ করেছিলেন। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করুণ যেমন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি পরম প্রশংসিত ও উন্নত।

তারপর বলুন-

اللّٰهُمَّ إنى أعوذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযানিল কবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল) হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব হতে এবং দুনিয়ার জীবনের ফিৎনা, মৃত্যুর পরের ফিৎনা ও মসিহ দজ্জালের ফিৎনা হতে।

৩। তারপর ডান পাশে মুখ ঘুরিয়ে বলুন “আস্সালমু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” একইভাবে বাম পার্শ্বেও মুখ ঘুরিয়ে সালাম করুন।

সালাতের রাকাআত সংখ্যা

সালাত	ফরজের পূর্বের সুন্নাত	ফরজ	ফরজের পরের সুন্নাত
ফজর	২ রাকাআত	২ রাকাআত	-
জোহর	২+২ = ৪ রাকাআত	৪ রাকাআত	২ রাকাআত
আছর	২+২ = ৪ রাকাআত	৪ রাকাআত	-
মাগরিব	২ রাকাআত	৩ রাকাআত	২ রাকাআত
এশা	২ রাকাআত	৪ রাকাআত	২ রাকাআত + বিতির
জুমুআ	২ রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ	২ রাকাআত	২+২ = ৪ রাকাআত। আর ঘরে আদায় করলে শুধু ২ রাকাআত

সালাতের কিছু আহকাম

১। পূর্বের সুন্নতঃ ইহা ফরযের পূর্বে আদায় করতে হয় আর ফরযের পরের সুন্নত ফরযের পরে আদায় করতে হয়।

২। সালাতে দাঁড়াতে হবে ধীরস্থির ভাবে। সিজদার জায়গাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এদিকে ও দিকে তাকানো নিষেধ।

৩। যখন ইমাম সাহেবের ক্বিরাত শুনা যায় তখন খুব খেয়ালের সাথে তা শুনতে হবে। আর যদি তা শুনা না যায়, তবে নিজে মনে মনে ক্বিরাত পড়তে হবে।

৪। জুম'আ এর ফরয ২ রাকা'আত। আর ইহা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র পড়া যাবে না। মসজিদে খুতবার পর তা পড়তে হবে।

৫। মাগরিবের ফরয ৩ রাকাত । প্রথম ২ রাক'আত ফজরের ২ রাকা'আতের মতই পড়তে হবে ২ রাকা'আত শেষে আত্তাহিয়াতু পড়ে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াতে হবে তৃতীয় তৃতীয় রাকা'আত পড়ার জন্য। তখন দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতে হবে। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে পূর্ব বর্ণিত নিয়মে রুকু, সিজদা করে দ্বতীয় বারের জন্য তাশাহুদের আসনে বসতে হবে। এভাবে সালাত পুরা করে ডানে ও বামে সালাম ফিরাতে হবে।

৬। জোহর, আসর ও এশারের ফরয ৪ রাকা'আত করে। প্রথম ২ রাকা'আত ফজরের ২ রাক'আতের মত আদায় করে আত্তাহিয়াতু পড়তে হবে। সালাম না ফিরিয়ে আল্লাহু আকবার বলে দৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে এবং শুধু সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। সালাম না ফিরিয়ে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে এবং শুধু সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। এমনি ভাবে চতুর্থ রাকা'আত পড়ে একইভাবে আত্তাহিয়াতু সম্পুর্ণ পড়ে ও অন্যান্য দু'আ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে ডানে ও বামে।

৭। বিতরের নামাজ ৩ রাকাত। প্রথমে ২ রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে। (প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরুন পড়ার ব্যাপারে সহিহ হাদিসসমূহে বর্ণিত আছে। অত:পর ১ রাকা'আত করে সালাম ফিরাতে হবে। উত্তম হচ্ছে রুকুতে যাবার পূর্বে নিম্মের দুআয়ে কুনুত পড়াঃ

اللّٰهُمَّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لايذل من واليت

ولايعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت (رواه أبوداؤد)

(আল্লাহুম্মা ইহদিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া ‘আফিনী ফীমান ‘আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওল্লাইতা, ওয়া বারিকলী ফীমা আ‘ফাইতা, ওয়াক্বিনী শাররা মা ক্বদাইতা, ফা ইন্নাকা তাক্বদী ওয়ালা ইয়াক্বাদা আলাইকা। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা, ওয়ালা ইয়া‘ইয়্যু মান ‘আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতা আলাইতা)। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

(হে আল্লাহ ! আমাকে ও ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে সামিল করুন যাদের আপনি হেদায়েত দিয়েছেন। যাদের সুস্থ রেখেছেন আমাকেও ঐ দলে সামিল করুন। আপনি যাদেরকে নিজ দায়িত্বে নিয়েছেন আমাকেও তাদের দলে সামিল করুন। আর আমাকে যা দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন। আর আমার সম্পর্কে যদি কোন খারাবী লিখে থাকুন তা থেকে আমাকে অব্যাহতি দান করুন। কারণ, আপনিই এগুলো নির্দিষ্ট করেন, অন্য কেউ আপনার উপর তা আরোপ করতে পারে না। আপনি যাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন তাকে কেউ অপমান করতে পারে না। আর যার সাথে শত্রতা পোষণ করেন সে কখনও সম্মানি হতে পারে না। হে আমাদের রব ! তুমি বরকতময় এবং সুমহান ও উচু।

৮। সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিতে তাড়াহুড়া করলে চলবে না। বরং সালাতে দাঁড়িয়ে তকবীর দিয়ে তারপর রুকুতে যেতে হবে, যদিও ইমাম রুকুতে থাকুন না কেন। তারপর রুকুতে যান। ইমাম রুকু হতে উঠার পূর্বেই যদি আপনি রুকুতে যেতে পারেন তবেই ঐ রাক‘আত ইমামের সাথে পেলেন। আর রুকু না পেলে আপনি ঐ রাকাআত পেলেন না।

৯। যদি ইমামের সাথে সালাতে যোগ দিয়ে দেখেন যে, ২/১ রাক‘আত ছুটে গেছে তবে ইমামের পিছনে বাকী সালাতে শরীক হন। তিনি সালাম ফিরালে আপনি সালাম না ফিরিয়ে উঠে বাকী রাক‘আতগুলো আদায় করুন।

১০। সালাতে তাড়াহুড়া করবেন না। কারণ তাতে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে সালাতে তাড়াহুড়া করতে দেখলেন। তাকে ডেকে বললেনঃ (ফেরত যেয়ে আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তুমি সালাত আদায় করোনি। তিনি এভাবে তিনবার বললেন। তৃতীয় বার ঐ সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ

কুকু‘তে যেয়ে পুর্ণ মাত্রায় স্থির হবে। তারপর রুকুর দু‘আ শেষে রুকু হতে উঠে ঠিকভাবে সোজা হয়ে দাড়াবে। তারপর সিজদা করবে পূর্ণ স্থিরতার সাথে। অতঃপর

সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বসবে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
১১। যদি সালাতের কোন ওয়াজিব ছুটে যায়। যেমন প্রথম বৈঠকে না বসে থাকেন অথবা কত রাক'আত আদায় করেছেন তাতে সন্দেহ থাকে, তখন কম সংখ্যক রাক'আত ধরে বাকী সালাত পূর্ণ করুন। তারপর সালাতের শেষে ২টা সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবেন। একে বলা হয় সাহু সিজদা।
সালাতের উপর কিছু হাদীস।

صلوا كما رأيتموني أصلي. (رواه البخاري)

তোমরা ঐভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছো (বুখারী)

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس . (رواه البخاري)

তোমাদের কেহ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন বসার পূর্বে যেন সে অবশ্যই দু রাকআত সালাত আদায় করে নেয়। (বর্ণনায় বুখারী)।
(এই সালাতকে তাহাইয়াতুল মসজিদ বলে)

لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (رواه البخاري)

তোমরা কবরের উপর উপবেশন কর না, এমনকি তার দিকে সালাতও আদায় কর না। (বর্ণনায় মুসলিম)

إذا أقيمت الصلوة فلا صلاة إلا المكتوبة (رواه مسلم)

যখন ইক্বামত হয়ে যায় তখন ফরজ সালাত ছাড়া অন্য সালাত নেই। (বর্ণনায় মুসলিম)

أمرت أن لا أكف ثوبا (رواه مسلم)

সালাতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে পোশাক না গুটাতে (বর্ণনায় মুসলিম)

أقيموا صفوفكم وتراصوا

তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, একের পা অপরের সাথে মিলিয়ে দাড়াও। অন্য রেওয়ায়াতে আছে (সাহাবাগণ বলেনঃ) আমরা সালাতে একে অপরের কাধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াতাম।

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

যখন ইক্বামত হয়ে যায় তখন তোমরা তাড়াহুড়া করে উপস্থিত হয়োনা। বরং স্বাভাবিক ও ধীরস্থির ভাবে হেটে আসবে। ইমামের সাথে যা পাও তা আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

এমনভাবে রুকু কর যাতে স্থিরতা আসে, তারপর রুকু হতে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাড়াও। এরপর সিজদা কর স্থিরতার সাথে)।

إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك

যখন সিজদা কর, হাতের পাতাদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে কনুইদ্বয় খাড়া রাখ। (বর্ণনায়: মুসলিম)

إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود (رواه مسلم)

আমি তোমাদের ইমাম, তাই রুকু ও সিজদাতে আমার আগে আগে যাবে না। (বর্ণনায় মুসলিম)

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر

কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম মানুষের যে হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সালাত। যদি উহা গ্রহণীয় হয় তবে সমস্ত আমলই ঠিক হবে। আর যদি তাতে দোষ ত্রুটি মিলে, তবে সমস্ত আমলেই দোষ ত্রুটি পাওয়া যাবে।

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বৎসর বয়স হতেই সালাতের আদেশ দিতে থাক। যখন দশ বৎসর পদার্পণ করবে তখন (সালাত না আদায় করলে) প্রহার করবে। আর তখন হতেই তাদের বিছানা আলাদা করে দেবে। (আহমদ, হাসান)

সালাতুল জুমুআ এবং জামাআত ওয়াজিব

সালাতুল জুমুআ এবং জামাআতে সালাত আদায় করা যে ওয়াজিব নিম্নে তার কিছু

দলিল পেশ করা হচ্ছেঃ-
১। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩﴾ الجمعة: ٩

হে ঈমানদানগণ ! জুম‘আর দিন যখন তোমাদের সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন বেচা-কেনাকে পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি আল্লাহকে স্মরণ করতে দৌড়ে আসো। উহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (সূরাতুল জুম‘আ ৯)
রাসূল . বলেনঃ

من ترك ثلاث جمع تهاونابها طبع الله على قلبه (رواه أحمد)

যে ব্যক্তি অলসতা করে পর পর তিন জুম‘আতে উপস্থিত হবে না, আল্লাহপাক তার অন্তরে মোহর (মোনাফেকের) লাগিয়ে দিবেন। (বর্ণনায় সহীহ আহমদ)
৩। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. (رواه مسلم)

একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল কিছু যুবককে আমার জন্য লাকড়ি যোগাড় করতে বলি। তারপর ঐ সমস্ত লোকদের ঘরে যাব যারা কোন ওযর ব্যতীত জামাতে উপস্থিত হয় না তাদেরকে ভিতরে রেখেই তাদের ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেই। (বর্ণনায় মুসলিম)
৪। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি আযান শোনার পরেও বিনা ওযরে মসজিদে উপস্থিত হয় না, তার সালাত আদায় হবে না। (বর্ণনায় সহীহ ইবনে মাজা) (ওযর হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা)
৫। এক অন্ধ সাহাবী (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে এমন কেউ নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে পৌঁছেতে পারে। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনুরোধ করলেন যাতে জামাতে না আসার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়। তাখন রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? বলেনঃ হাঁ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তাহলে অবশ্যই জামাতে

উপস্থিত হও। (বর্ণনায় মুসলিম)

৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) সে মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্ তালার সাথে সাক্ষাৎ করবে তবে সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হেফাজত করে এবং যেখানে আযান দেয়া হয় সেখানে আদায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যে সুন্নাতগুলো নির্দিষ্ট করেছেন তা হেদায়েত স্বরূপ। যদি তোমরা ঘরেই সালাত আদায় করতে থাক, যেমন ভাবে পশ্চাৎপদরা করে থাকে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতকে ত্যাগ করতে শুরু করবে। আর যখনই তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে ত্যাগ করতে থাকবে তখনই গোমরাহ হতে থাকবে। আমরা আমাদের যামানায় দেখেছি, প্রাকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামা'আত তরক করত না। যদি কেউ সালাতে না আসতে পারত তবে তাকে দুই ব্যক্তি সাহায্য করে কাতারে দাড় করিয়ে দিত। (বর্ণনায় মুসলিম)

জুমুআ ও জামাআতের ফজিলত

১। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له . ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته . ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে উত্তম রূপে গোসল করে জুম'আ পড়তে আসে তারপর যতটুকু সম্ভব নফল সালাত আদায় করে, অতঃপর ইমামের খুতবা শুনে খুবই মনোযোগের সাথে এবং তার পিছনে সালাত আদায় করে, তবে এক জুম'আ হতে অন্য জুম'আ পর্যন্ত তার গুনাহসমূহ এবং অধিক আরও তিনদিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বর্ণনায় মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ، فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الثالثة ، فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة ، فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিনে ফরজ গোসলের মত উত্তরমরূপে গোসল করে, তারপর মসজিদে গমন করে, সে যেন একটা উট কোরবানী দিল। তার পরে যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করে সে যেন একটা গরু কোরবানী করল। তার পরে যে গমন করল সে যেন শিংওয়লা একটা ভেড়া কোরবানী করল। তার পরে যে গমন করল সে যেন একটা মুরগী কোরবানী করল। তার পরের জন যেন একটা ডিম দান করল। তারপর যখন ইমাম খুতবা দিতে বের হন তাখন ফেরেশ্তারা (মালাইকা) খুতবা শুনতে চলে যায়। (বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম)

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل . ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله

যে ব্যক্তি এশা জামাতে আদায় করে সে যেন অর্ধরাত্র ইবাদতে কাটাল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করল সে যেন পুরা রাত্র ইবাদতে কাটাল। (বর্ণনায় মুসলিম)

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায় করে সে ঘরে বা বাজারে উহা আদায় করলে যে সওয়াব পেত তার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াব পাবে। তার কারণ হল, যখন তোমাদের কেউ উত্তম রূপে ওযু করে তারপর মসজিদে গমন করে, (আর এতে তার নিয়ত যদি সালাত আদায় করা ছাড়া আর কিছু না হয়) তবে তার প্রতি পদক্ষেপে একটা করে জান্নাতের মর্যাদার স্তর উঁচু হতে থাকে আর তার একটা করে গুনাহ্ মাফ হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। তারপর যতক্ষণ মসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ সে সালাতে রত আছে গণ্য হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওখানে বসা থাকে ফেরেশ্তারা (মালাইকারা) তার জন্য মাগফেরাত চাইতে থাকে। তাঁরা বলতে থাকেঃ হে আল্লাহ ! তার উপর দয়া কর। তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তাঁর তাওবা কবুল কর। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্যকে কষ্ট দেয় বা ওযু ভেঙ্গে না যায়। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)

আদবের সাথে কিভাবে জুমু‘আর সালাত আদায় করব

১। জুমু‘আর দিনে নখ কাটব। ওজু করে উত্তমভাবে গোসল করব। উত্তম পোশাক পরিধান করে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করব।

২। ঐ দিন কাঁচা পেয়াজ বা রসুন খাব না। ধুমপান করব না। দাঁতকে পরিষ্কার করব মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে।

৩। মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকা‘আত তাহিয়াতুল মসজিদের সালাত আদায় করব, এমনকি ইমাম খতবা দিতে দাঁড়ালেও
কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما

যদি তোমাদের কেউ জুমু‘আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে ঐ সময়, যখন ইমাম খুতবা দিতে থাকে তখন সে যেন সংক্ষেপে দু রাক‘আত সালাত আদায় করে। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)

৪। তারপর ইমাম খুতবা দিতে শুরু করলে উহা মন দিয়ে শুনব, অন্য কোন কথাবর্তা বলব না।

৫। তারপর ইমামের সাথে দু রাক‘আত জুমু‘আর ফরজ আদায় করব।

৬। তারপর চার রাক‘আত বাদাল জুমু‘আ সুন্নাত আদায় করব। অথবা ঘরে ফিরে গিয়ে দু রাক‘আত আদায় করব। আর এটাই উত্তম।

৭। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ বেশী বেশী করে নবীর উপর দরুদ পড়বে।

৮। জুমু‘আর দিনে বেশী বেশী করে দু‘আ করব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জুমু‘আর দিনে এমন একটি মুহুর্ত আছে যখন কোন মুসলিম আল্লাহর নিকট উত্তম কোন দু‘আ করে অবশ্যই তা তাকে দিয়ে দেন। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)

৯। জুমু‘আর দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করে, তার জন্য দুই জুমু‘আর মাঝের সময়টা নূর দিয়ে ভরে দেন। (বর্ণনায়, সহীহ হাকেম)

১০। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে, উহা তার জন্য নূর হবে তার নিকট হতে আল্লাহর ঘর পযন্ত। (সহীহ জামে‘ আসসগীর)

অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সালাত আদায় করা ওয়াজিব

হে আমার মুসলিম ভাই ! রোগাক্রান্ত অবস্থাতেও সালাত ত্যাগ করার ব্যাপারে সাবধান হোন। কারণ, উহা আদায় করা আপনার উপর ওয়াজিব। এমনকি আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের ময়দানেও সালাত আদায় করা ওয়াজিব করেছেন।

জেনে রাখুন, সালাত আদায়ে রুগীর মনে শান্তি উদ্রেক করবে, আর উহা তার সুস্থতা

আনয়নে সহায়তা করবে। আল্লহপাক বলেনঃ

﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ ٤٥ ﴾ البقرة: ٤٥

তোমরা আল্লাহর নিকট সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। (সূরা আল-বাক্বারা, ৪৫)
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বিলাল (রাঃ) কে বলতেনঃ

يا بلال أقم الصلاة أرحنابها (رواه ابوداؤد و حسن اسناده)

হে বিলাল! সালাতের জন্য ইক্বামত দাও যাতে আমরা শান্তি পাই। (আবু দাউদ, হানান সনদ) রুগী যদি মৃত্যু পথযাত্রী হয় তবে তার জন্য উত্তম হল সালাতের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা, আর সালাত ত্যাগ করে পাপী হয়ে মৃত্যু বরণ না করা। আল্লাহ তাআলা রুগীদের জন্য সালাতকে সহজ করেছেন। পানি ব্যবহার করতে অপারগ হলে ওযু বা ফরজ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে পাক হয়ে সালাত আদায় করবে। তবুও সালাত ত্যাগ করবে না।
আল্লাহ তাআলা বলেন :

ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ ﴾ المائدة: ٦

যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ মল ত্যাগ করে আসে, অথবা কেউ স্ত্রী সহবাসকারী হও এবং তারপর পানি না পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। উহা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মসেহ করে নাও। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমাদের কষ্টে ফেলতে চান না। কিন্তু তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামতসমূহ তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পার। (সূরা আল-মায়েদা, ৬)

কিভাবে রুগীরা পবিত্রতা হাসিল করবে

১। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সে ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করবে ওযুর

মাধ্যমে এবং বড় নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিল করবে গোসলের মাধ্যমে।

২। যদি পানি দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করতে সে অসমর্থ হয়, পানির অভাবে, বা রোগ বৃদ্ধির ভয়ে, অথবা রোগ নিরাময়ে দেরী হতে পারে এই আশঙ্কায়, তখন সে তায়াম্মুম করবে।

৩। তায়াম্মুম করার পদ্ধতিঃ পবিত্র মাটিতে দু'হাত দিয়ে একবার আঘাত করবে, তারপর তালু দিয়ে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল একবার মসেহ করবে। এরপর এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের কনুইসহ মসেহ করবে, প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।

৪। যদি সে নিজে নিজে ওযূ করতে বা তায়াম্মুম করতে অসমর্থ হয়, তবে অন্য কেউ তাকে ওযু বা তায়াম্মুম করিয়ে দেবে।

৫। যদি তার ওযুর কোন অঙ্গ কাটা থাকে তবে সে উহা পানি দ্বারা ধৌত করবে। যদি পানিতে উহার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে হাত ভিজিয়ে তা ঐ স্থানে বুলাবে। যদি তাতেও তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে।

৬। যদি তার ওযুর কোন অঙ্গের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকে, তবে সে উক্ত অঙ্গের উপর পানি দিয়ে মসেহ করবে, ধুবে না। তখন আর তায়াম্মুমের প্রয়োজন নাই। কারণ, ধৌত করার পরিবর্তে মসেহ করা হয়েছে।

৭। দেয়াল বা অন্য কোন পাক জায়গায় যেখানে ধুলাবালি লেগে আছে, সেখানে হাত মেরে তায়াম্মুম করা যায়। কিন্তু দেওয়ালে যদি তৈলাক্ত কোন পদার্থ থাকে তবে তাতে তায়াম্মুম করা যাবে না।

৮। যদি মাটিতে বা দেওয়ালে বা অন্যত্র তায়াম্মুম করার জন্য ধুলা না মিলে, তবে কোন পাত্রে বা রুমালে ধুলা নিয়ে তাতে হাত মেরে তায়াম্মুম করা যাবে।

৯। যদি কেউ এক ওয়াক্তের জন্যে তায়াম্মুম করে, তারপর পাক অবস্থায় অন্য ওয়াক্ত এসে যায় তবে প্রথম বারের তায়াম্মুমই যথেষ্ট। নূতন করে আর তায়াম্মুম করতে হবে না। কারণ সে তায়াম্মুমের দ্বারা পাক পবিত্র অবস্থায় আছে এবং এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে জন্য তা নষ্ট হয়ে গেছে।

১০। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে নাপাকী হতে তার শরীরকে পবিত্র করা। যদি উহা করতে অসমর্থ হয় তবে ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। ঐ অবস্থার সালাত তার জন্য সহীহ হবে, নূতন করে আর আদায় করতে হবে না।

১১। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে পাক কাপড় পরে সালাত আদায় করা। যদি পোশাকে নাপাকি লাগে তবে তাকে পাক করা তার উপর ওয়াজিব। অথবা অন্য কোন পাক পোশাক পরিধান করবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয় তবে ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। একে আর পরে নতুন করে আদায় করতে হবে না।

১২। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে কোন পাক স্থানে সালাত আদায় করা। যদি ঐ জায়গা নাপাক হয়ে যায় তবে তাকে ধৌত করা ওয়াজিব। অথবা পাক কোন জিনিসের উপর সালাত আদায় করতে হবে। যদি এগুলোর কোনটা সম্ভবপর না হয় তবে যে ভাবে আছে সেভাবেই সালাত আদায় করবে। এতেই তার সালাত সহীহ হবে, নতুন করে আর আদায় করতে হবে না।

১৩। রুগী কোন অবস্থাতে পবিত্রতা হাসিল করতে অসমর্থ হলেও ওয়াক্তের সালাত দেরী করে পড়বে না।

সাধ্যমত পাক হতে চেষ্টা করবে। তারপর নির্দিষ্ট ওয়াক্তেই সালাত আদায় করবে। এমনকি যদি তার শরীর, পোশাক বা সালাত আদায়ের স্থানে কোন নাপাকী থাকে যা দুরীভুত করতে সে অসমর্থ হয় তবুও।

রুগী কিভাবে সালাত আদায় করবে

১। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে ফরজ সালাত দাড়িয়ে আদায় করা, যদিও তা ঝুকে আদায় করে বা কোন দেওয়ালে বা লাঠিতে ভর করে আদায় করতে হয়।

২। যদি কোন মতেই দাড়াতে সমর্থ না হয়, তবে যেন বসেই আদায় করে। তবে রুকু ও সিজদার সময় মাথা বেশী ঝুকাতে চেষ্টা করবে।

৩। যদি বসে ও পড়তে সমর্থ না হয়, তবে যেন শয্যায় কাত হয়ে কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে। ডান কাত উত্তম। যদি কোন ক্রমেই সে কেবলা মুখী হতে না পারে তবে যেদিকে মুখ করে সম্ভব সেদিকেই সালাত আদায় করবে। এতেই তার সালাত সহীহ হবে নতুন করে আর আদায় করতে হবে না।

৪। যদি কাত হয়ে সালাত আদায় করাও তার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে কেবলার দিকে পা দিয়ে সালাত আদায় করবে। এই আবস্থায় উত্তম হচ্ছে মাথা কিছুটা উঁচু করে কেবলার দিকে ফেরা। যদি তার পা কেবলার দিকে ফিরান সম্ভবপর না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই যেন আদায় করে। এ সালাত আর নতুন করে আদায় করতে হবে না।

৫। রুগীর জন্য ওয়াজিব হচ্ছে সালাতের মধ্যে রুকু ও সিজদা করা। যদি সে তা করতে সমর্থ না হয় তবে মাথা দ্বারা ইশারা করে উহা আদায় করবে। সিজদার সময় মাথাকে বেশী নিচু করবে। যদি রুকু করতে সমর্থ হয় তবে তা করবে এবং সিজদা করবে ইশারাতে। যদি শুধু সিজদা করতে সমর্থ হয়, তবে তাই করবে এবং রুকু ইশারায় করবে। এই অবস্থায় কোন বালিশের উপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই।

৬। যদি অবস্থা এমন হয় যে, রুকু ও সিজদাতে মাথা দিয়ে ইশারাও করতে না

পারে, তবে যেন চোখ দিয়ে ইশারা করে। রুকুর সময় অল্প করে চক্ষু বন্ধ করবে আর সিজদার সময় বেশী করে চোখ বন্ধ করবে। কোন কোন রুগী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। তা সহীহ নয়। এই ব্যাপারে কুরআন ও হদীসে কোন দলিল নেই। অথবা কোন আলেমের ফতোয়াও নেই এ ব্যাপারে।

৭। যদি মাথা দিয়ে বা চোখ দিয়ে ইশারা করতেও সে অসমর্থ হয় তবে সে অন্তরে অন্তরে সালাত আদায় করবে। তকবীর বলবে এবং সুরা পড়বে, রুকু সিজদাতে দাড়ান ও বসার নিয়ত করবে। কারণ, প্রত্যেকে তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে।

৮। রুগীদের উপর ওয়জিব হচ্ছে, প্রতিটি সালাত সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং সাথে সাথে যে সমস্ত ওয়াজিবসমূহ আছে তাও তার সাধ্যতম আদায় করতে চেষ্টা করবে। যদি তার জন্য প্রতিটি সালাত ওয়াক্ত মত আদায় করা কঠিন হয়ে দাড়ায়, তখন জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা আকত্র করে পড়বে। হয় আসরকে জোহরের সাথে এবং এশাকে মাগরিবের সাথে মিলিয়ে“জামা তাকদীম” পড়বে। অথবা জোহরকে আসরের সাথে পড়বে এবং মাগরিবকে এশার সাথে মিলিয়ে “জমা তাখীর ” পড়বে। যেটা তার জন্য সহজ সেটাই করবে। কিন্তু ফজরের সালাতের কোন জমা নেই আগে বা পরের সালাতের সাথে।

৯। যদি কোন রুগী চিকিৎসার জন্য তার এলাকার বাইরে সফরে থাকে তখন সে চার রাক‘আতের সালাত দুই রাক‘আত করে পড়বে (এশা, যোহর ও আসর) যতক্ষণ পর্যন্ত না তার দেশে বা শহরে ফেরত আসে। সেই সফরের সময় দীর্ঘ হোক বা অল্প দিনের জন্যই হোক। (শাইখ মহাম্মদ সালেহ আল-উসাইমিন)

সালাতের শুরুতে দুআসমূহ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ ফরয সালাতের শুরুতে বলতেনঃ

اللّٰهُمَّ باعد بيني وبين خطاياي ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللّٰهُمَّ نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللّٰهُمَّ اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد

হে আল্লাহ ! আমার গুনাহগুলো আমার থেকে এত দূরে করে দিন যেমন ভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব বানিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ হতে আমাকে ঐভাবে পবিত্র করুন, যেমন ভাবে সাদা পোশাককে ময়লা নাপাকি হতে পাক করা

হয়। হে আল্লাহ ! আমার গুনাহসমূহকে পানি, বরফ ও শীল দ্বারা ধৌত করে পাক করে দিন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ ফরয ও নফল সালাতে নিম্মোক্ত দু'আ পড়তেনঃ

اللّٰهُمَّ أنت الملك لا إلٰه إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك

হে আল্লাহ ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই, আপনিই আমার রব এবং আমি আপনার দাস। নিজের উপর জুলম করেছি এবং আমার গুনাহও স্বীকার করছি। তাই মেহেরবানী করে আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। কারণ, আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। হে আল্লাহ ! মেহেরবানী করে আমাকে উত্তম চরিত্রগুণে বিভূষিত করুন। কারণ, আপনি ছাড়া কারো এ ক্ষমতা নেই। আপনার কাছেই আমি উপস্থিত। আপনার হাতে সকল কল্যাণ। আপনার প্রতি কোন মন্দ ধাবিত নয়। আমি আপনার সাথে আপনার দিকেই। আপনি বরকতময় ও মহান। আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি ও তওবা করছি। (বর্ণনায় : মুসলিম)

সালাতের শেষের দুআ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্মোক্ত দু'আ সালাতের শেষে সালাম ফেরানোর পূর্বে পড়তেন।

إني أعوذ بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر . ومن فتنة المحيا والممات . ومن شر فتنة المسيح الدجال

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাই। আর দুনিয়ার জীবনের ও মৃত্যুর পরের ফিতনা হতে আশ্রয় চাই। সাথে সাথে দজ্জালের নিকৃষ্ট ফিতনা হতে আশ্রয় চাই চাই।

(বর্ণনায় মুসলিম)
২। এছাড়া তিনি আরও পড়তেনঃ

اللَّهُمَّ ! إني أعوذ بك من شر ما عملت ، وشر ما لم أعمل " .

হে আল্লাহ ! আমি যে সমস্ত খারাপ কাজ করেছি তা হতে ক্ষমা চাই, আর যে সমস্ত খারাবী করিনি, তা হতেও বাঁচতে চাই। (বর্ণনায় নাসায়ী)

মৃতদের জন্য সালাত আদায় করার পদ্ধতি
(সালাতুল জানাযা)
প্রথমে মনে মনে নিয়ত করতে হবে। তারপর চার বার তকবীর দিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।
১। প্রথম বার তাকবীর বলার পর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সম্পুর্ণ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।
২। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদে ইব্রাহীম পড়তে হবে।
৩। তৃতীয় তাকবীরের পর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যে দু'আ বর্ণিত আছে তা পড়তে হবে। আর তা হল-

اللَّهُمَّ اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،

"আল্লাহুম্মাগ্‌ফীর লিহাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াতাহু মিন্না ফা-আহিয়হি' আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওফফাহু আলাল ঈমান।

হে আল্লাহ ! দয়া করে আমাদের জীবতি ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকেই ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের যাদেরকে জীবিত রেখেছেন তাদের ইসলামের উপর জীবিত রাখুন আর আমাদের যাদের মৃত্যু দান করেন তাদের ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন।
তারপর বলতেনঃ

اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده

হে আল্লাহ ! তাদের সওয়াব হতে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং তাদের পর আমাদের ফিৎনাতে লিপ্ত করবেন না।

৪। চতুর্থ তাক্ববীরের পর মনে যা চায় সেইভাবে দু‘আ করতে হবে এবং ডান দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ ﴾ آل عمران: ١٨٥

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমরা তোমাদের পুরস্কার ও প্রতিদান পাবে কিয়ামতের দিন। যাকে জাহান্নামের আগুন হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, সেই সফলকাম হবে। নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন ধোকার সামগ্রী। (সূরা আল-‘ইমরান, ১৮৫)

কবি বলেনঃ ঐ জিনিস, যার থেকে নিষ্কৃতি নেই, তার জন্য অবশ্যই তৈরী হতে হবে। কারণ, মৃত্যুই হচ্ছে বান্দার শেষ ঠিকানা। হে আল্লাহ ! আপনি তো চিরঞ্জীব, আমি যা গুনাহ করেছি তা হতে তওবা করছি, আপনি কবুল করুন। স্থির হয়ে যাবার পূর্বেই (মৃত্যু আসার পূর্বেই) সাবধান হউন! আপনি যদি প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ছাড়াই সফরে বের হন তবে অবশ্যই আফসোস করবেন। যখনই আপনার ডাক পড়বে তখনই দুর্ভাগাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। আপনি কি ঐ সমস্ত বন্ধুদের সাথী হতে চান যারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সাথে নিয়েছেন। আর শুধুমাত্র আপনার হাতই থাকবে শূন্য?।

দুই ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করা

১। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন। ঐ দিন দুটোতে প্রথম যে কাজ করতেন তা হল ঈদের সালাত আদায় করা।

(বর্ণনায় বুখারী)

২। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ঈদুল ফিতরের সালাতে প্রথম রাক‘আতে সাত বার এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ৫ বার তকবীর দিতে হবে। আর এই রাক‘আতেই তকবীরের পর ক্বিরাত পড়তে হবে। (হাসান, আবুদাউদ)

৩। এক সাহবী (রাঃ) বলেনঃ

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى، العواتق والحيض

وذوات الخدر، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت :
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها.

আল্লহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মহিলাদের নিয়ে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের হতে নির্দেশ দিতেন। তার মধ্যে থাকত স্বাধীন মহিলা, ঋতুবতি মহিলারা ও পর্দানশী মহিলারা। তবে ঋতু আক্রান্ত মেয়েরা দূরে বসে থাকত, সালাতে শরীক হত না। তারা কল্যাণকর কাজ এবং মুসলিমদের দু'আতে শরীক হত। আমি বললামঃ আমাদের অনেকের পরিধান করার মত চাদর নেই, সে কি করবে? তিনি বললেন, তাদের বোনেরা তাদের চাদর পরিধান করাবে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১। দু ঈদের সালাতের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান রয়েছে। উহা ২ রাক'আত। প্রথম রাক'আতের শুরুতে মুসল্লিগণ ৭ বার তকবীর বলবে। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতের শুরুতে ৫ বার তকবীর বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত পড়বে।

২। ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করার হুকুম। আর তা ছিল মদীনা শরীফের নিকটবর্তী এক নির্দিষ্ট স্থান। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাদা ঐ স্থানে যেয়ে সাহাবীদের নিয়ে দু ঈদের সালাত আদায় করতেন। তাদের সাথে বের হতেন বালিকারা এবং যুবতী মেয়েরা, এমনকি ঋতুবতি মহিলাগণও। হাফেজ ইবনে হজার আসকালানী রহ. বলেনঃ এর থেকে এই মাস'আলা সাবেত হল যে, মুসল্লাতে এই সালাত আদায় করতে হবে। খুব জরুরী ওযর ব্যতীত ইহা মসজিদে আদায় করা ঠিক নয়।

ঈদের দিনে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে তাকিদ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعله فقد أصاب
سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء)

ঈদের দিনে আমাদের সর্বপ্রথম আমল হচ্ছে সালাত আদায় করা। তারপর ঘরে ফিরে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এই আমল করল সে আমাদের সুন্নাতকে পালন

করল। আর যে সালাতের পূর্বে কুরবানী করল সে যেন তার পরিবারের জন্য গোশ্ত প্রেরণ করল। ইহাতে কোরবানীর কোন ইবাদত হল না।
(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
২। অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে লোকসকল! নিশ্চয় প্রত্যেক বাড়িতে কুরবানী দেওয়া জরুরী (বর্ণনায় আহমদ, হাসান)
৩। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا

যার কুরবানী করার সামর্থ আছে, তৎসত্ত্বে ও সে যদি তা না করে, তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহতে উপস্থিত না হয়। (বর্ণনায় আহমদ, হাসান)

এসতেসকা বা বৃষ্টির জন্য সালাত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ঈদগাহে বের হন বৃষ্টির সালাতের জন্য। তারপর বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এরপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে ২ রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর চাদর উল্টিয়ে ডান পার্শ্বকে বামে স্থাপন করলেন। (বর্ণনায় বুখারী)
২। আনাস ইবনে মালেক রা. বলেনঃ ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এর যামানায় যখন অনাবৃষ্টি হয়েছিল, তখন আব্বাস রা. এর অসিলায় (দু'আর মাধ্যমে) বৃষ্টি চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! (নবীর যামানায়) আমরা নবীর অসিলায় আপনার নিকট বৃষ্টি চাইতাম আর আপনিও উহা দিতেন। আর আজ আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আব্বাস রা. এর অসিলায় (দু'আয়) বৃষ্টি চাচ্ছি, দয়া করে বৃষ্টি দান কর। সাথে সাথে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। (বর্ণনায় বুখারী)
এই হাদীস থেকে আমরা এই দলীল পাচ্ছি যে, সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় তাঁর নিকট দু''আ চাইতেন বৃষ্টির জন্য। যখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট চলে গেলেন, তখন আর তারা তাঁর অসীলায় দু'আ করতেন না। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস রা. এর নিকট দু'আ চাইলেন, যিনি জীবিত ছিলেন।
তখন আব্বাস রা. তাদের জন্য আল্লাহপাকের নিকট দু'আ করলেন।

খুসূফ ও কুসুফের সালাত
(চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের নামাজ)

১। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একদা সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এক ঘোষককে পাঠালেন এই ঘোষণা দিতে যে, সালাতের জন্য একত্রিত হও। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং ২ রাকা'আত সালাতে ৪ বার রুকু ও ৪ বার সিজদা করলেন। (বর্ণনায় বুখারী)

২। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে সালাতে মগ্ন হন। খুব লম্বা করে কিরাত পড়লেন। তারপর খুব লম্বা করে রুকু করলেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন। তারপর আবার দীর্ঘ কিরাত পড়লেন, তারপর আবার রুকুতে যেয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেন। তারপর রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়িয়ে সিজদাতে গেলেন। তারপর দু'বার সিজদা করলেন। তারপর সিজদা হতে দাড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আত আদায় করলেন প্রথম রাকা'আতের অনুরূপ। সালাম ফিরালেন। ততক্ষণে সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। এরপর খুতবা দিলেন এবং বললেনঃ নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে ঘটে না। তারা আল্লাহপাকের নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দেখান। যখনই তোমরা ইহা দেখতে পাবে তখনই সাথে সাথে সালাতে লিপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে থাক, সালাত আদায় করতে থাক এবং দান সাদকাহ করতে থাক।

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত ! কোন পুরুষ বা নারী যখন যিনা করে তখন আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশী কারো আত্নসম্ভ্রমে আঘাত লাগে না। ওহে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম, আমি যা জ্ঞাত আছি তা যদি তোমরা জানতে তবে খুব কমই হাসতে আর বেশী বেশী করে কাঁদতে। ওহে, আমি কি (আমার কথা) পৌঁছিয়েছি? (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

এস্তেখারার সালাত

জাবের রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে সর্বদা সর্ব কাজে এমনি ভাবে এস্তেখারা শিখাতেন যেমনি ভাবে শিখাতেন কোরআনের সূরা। তিনি বলতেন যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করতে উদ্যত হও তখন দু রাকা'আত নফল নামায আদায় কর। অতঃপর বলঃ

اللّٰهُمَّ إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللّٰهُمَّ إن كنت تعلم

أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به

আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখিরুকা বি'ইলমিকা, ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাজলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু। ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লামুল-গুয়ুউব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরু খাইরুন লী ফীদীনী ওয়া মাআশী ওয়া 'আকিবাতি আমরি (আও কালা ফী আ'জিলি আমরি ওয়া আজিলি) ফাকদিরহু লী, ওয়া ইয়াসসিরহু লী, ছুম্মা বারিকলী ফীহি, ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন লী ফী দীনী ওয়া মাআ'শী ওয়া 'আকিবাতি আমরি। ফাসরিফহু আননি ওয়াসরিফনী আনহু। ওয়াকদুরলি আলখাইরা হাইসু কানা, সুম্মা রাদ্দিনী বিহি। (বর্ণনায় বুখারি)

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট কল্যাণ চাচ্ছি আপনার ইলমের অসিলায়, আর আপনার কুদরতী সাহায্য চাচ্ছি আপনার কুদরতের অসিলায় আর আপনার নিকট চাচ্ছি আপনার মহান ফজলের অসিলায়। নিশ্চয়ই আপনি কর্মক্ষম আর আমি অক্ষম। আপনি জ্ঞাত আছেন, আমি জ্ঞাত নই। নিশ্চয় গায়েবের সমস্ত কিছু আপনি জ্ঞাত আছেন। হে আল্লাহ! যদি আপনি মনে করেন, এই কাজ (এখানে নিজের কাজটা উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দ্বীনের দিক দিয়ে, দুনিয়ার দিক দিয়ে ও পরবর্তী জীবনের জন্য তবে উহাকে আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর উক্ত কাজে আমাকে বরকত দান করুন। আর যদি মনে করেন এই কাজ (কাজ উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্য ক্ষতিকর আমার দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য তবে উহাকে আমা হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন এবং আমাকেও উহা হতে দূরে রাখুন। আর যে কাজে আমার মঙ্গল আছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করুন। তারপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

সহি হদিস মতে এই সালাত আদায়ে উত্তম হলো প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরুণ এবং দ্বিতীয় রক'আতে সূরা ফতিহার সাথে সূরা ইখলাস মিলিয়ে পড়া। এই সালাত ও দু'আ প্রত্যেকে তার নিজের জন্য করবে যমন ঔষুধ নিজেই পান করে, এই নিয়তে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ঐ কাজে তাকে সঠিক রাস্তা দেখাবেন। আর কবুলের নিদর্শন হচ্ছে তার জন্য আসবাব (উপকরণ) সমূহ

সহজ করে দেবেন। আর ঐ বেদআতী এস্তেখারা হতে নিজকে হেফাজত করুন যাতে আছে স্বপ্নের উপর নির্ভর করা এবং স্বামী স্ত্রীর নামে হিসাব করা বা অন্যান্য জিনিস যার সম্বন্ধে দ্বীনের কোন নির্দেশ নাই।

সালাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

যদি কেউ জানত যে, সালাত অবস্থায় কোন ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাওয়াটা কত বড় অন্যায়, তাহলে তার জন্য উত্তম হত ৪০ (দিন বা বছর) অপেক্ষা করা। (বর্ণনায় বুখারী)

ইবনে খুযাইমার রেওয়ায়েতে আছে ৪০ বছর।

এই হাদীস সালাত আদায়কারীর সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে যাওয়ার কথা বুঝাচ্ছে। তাতে আছে পাপ ও ভয় প্রদর্শন। সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কি ধরণের পাপ হয় তাহলে ৪০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু যদি সে সিজদার জায়গার বাইরে দিয়ে অতিক্রম করে, তবে তাতে কিছু হবে না এটাই হাদীসের ভাষ্য।

আর মুসুল্লির জন্য জরুরী হচ্ছে, সে তার সম্মুখে সুতরার ব্যাবস্থা করবে, যাতে করে তার সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় অতিক্রমকারী সাবধান হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সালাতে দাড়ায় তখন যেন মানুষ হতে সুতরা করে নেয়। তারপর ও যদি কেউ সুতরার ভিতর দিয়ে যেতে চায় তবে সে যেন তাকে গলা ধাক্কা দেয়। যদি বাধা না মানে তবে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কারণ সে ব্যক্তি শয়তান। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

এটা সহীহ হাদীস যা বুখারীতে আছে। আর এই হাদীস মসজিদূল হারাম ও মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কেই শামিল করে। কারণ, যখন তিনি এই হাদীস বলেন তা হয় মক্কায়, না হয় মদীনায় বলেছিলেন। এর দলিল হচ্ছেঃ ফতহুল বারীতে আছেঃ ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফে বসে আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা দেন। তারপর বলেনঃ

যদি সে বাধা না মানত তবে অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করতাম। হফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ এখানে কা'বা শরীফের ঘটনা এজন্য উল্লেখ করা হল যাতে করে লোকেরা এই ধারণা না করে যে, প্রচন্ড ভীড়ের কারণে ঐস্থানে মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করা ক্ষমা যোগ্য।

২। কিন্তু যে হাদীসে আছে যে, কা'বা শরীফে সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করলে এবং তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন গুনাহ হবে না, তা সঠিক নয়।

৩। বুখারীতে আছে, জুহাইফা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করতে বের হন এবং মক্কার বাতহা নামক স্থানে যোহর ও আসর আদায় করেন ২ রাক'আত করে। তখন তাঁর সামনে ছোট লাঠি ছিল সুতরা হিসাবে।

মূল কথাঃ যে স্থানে মুসল্লি সিজদা করে সেই স্থান দিয়ে যাতায়াত করা হারাম। তাতে পাপ হয় এবং শক্ত আযাবের ভয়ও আছে যদি মুসল্লির সামনে সুতরা থাকে। তবে কেউ যদি প্রচন্ড ভীড়ের কারণে অপারগ হয় তবে তার জন্য অতিক্রম করা জায়েয আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাত ও সালাত

১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ المزمل: ٤

আর আপনি কোরআনকে ধীরে ধীরে পড়ুন। (সূরা আল মুযযাম্মিল ৪)

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তিনদিনের কম সময়ে পুরা কোরআন খতম দিতেন না। (বর্ণনায় তিরমিযি)

৩। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াতের সময় প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামতেন। যেমনঃ আলহামদু লিল্লাহি রাববীল আলামীন বলে থামতেন তারপর আর রাহমানির রাহীম বলতেন। (বর্ণনায় তিরমিযি)

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোরআনকে সুন্দর করে তিলাওয়াত কর। কারণ, সুন্দর কণ্ঠস্বর কোরআন তিলাওয়াতকে আরো সুন্দর করে তুলে। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআনকে বেশ টেনে টেনে পড়তেন। (বর্ণনায় আহমদ)

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোরগের আওয়াজ শুনলে ঘুম হতে উঠতেন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে জুতা পাঁয়ে দিয়ে সালাত

আদায় করতেন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত দিয়ে তাসবীহ গুনতেন। (বর্ণনায় তিরমিযি ও আবু দাউদ)

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে যখন কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হত, তখনই তিনি সালাতে মগ্ন হতেন। (বর্ণনায় আহমদ ও আবু দাউদ)

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতের মধ্যে বসতেন, তখন হাটুদ্বয়ের উপর হতের পাতাদ্বয় স্থাপন করতেন। তারপর তর্জনী উঠিয়ে রাখতেন, উহা দ্বারা দু'আ করতেন। (বর্ণনায় মুসলিম)

১১। কখনও তর্জনী নেড়ে দু'আ করতেন। (বর্ণনায় নাসায়ী)

আর তিনি বললেনঃ উহা শয়তানের জন্য লোহা দ্বারা আঘাত করা হতেও শক্ত। (বর্ণনায় আহমদ)

১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে বুকের উপর, বাম হতের উপর ডান হাত স্থাপন করতেন। (বর্ণনায় ইবনে খুযাইমা)

ইমাম নববী রহ. মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীস দুর্বল।

১৩। চার মাযহাবের ইমামগণই বলেছেন, যদি হাদীস সহীহ হয় তবে উহাই আমার মাযহাব। এর থেকে এটা সাবেত হল যে, সালাতে তর্জনী নাড়ান, বুকের উপর হাত বাঁধা তাদের মাযহাব। আর উহা সালাতের সুন্নাত।

১৪। সালাতে আঙ্গুল নাড়ানোর আমল গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক (রঃ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এবং কিছু কিছু শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা। আর আগের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুল নাড়ানোর হিকমত উল্লেখ করেছেন। কারণ, এই নাড়া আল্লাহর তাওহীদের দিকে ইশারা করে। আর এই নড়াচড়া শয়তানের জন্য লোহার আঘাত হতেও শক্ত। কারণ, সে তাওহীদকে অপছন্দ করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী হল, সে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করবে। তাঁর কোন সুন্নতকে অস্বীকার করবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ঐভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমকে আদায় করতে দেখছ। (বর্ণনায় বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত

১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ٢ ﴾ المزمل: ١ - ٤

হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি ! উঠুন ইবাদত করুন, রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ে। (সূরা আল-মুয্যাম্মেল ১.২)

২। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান বা অন্য কোন সময়ে রাত্রে ১১ রাক'আতের বেশী তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না। প্রথমে ৪ রাক'আত পড়তেন। তা যে কত সুন্দর ও লম্বা হত তা বলার মত নয়। তারপর আরও ৪ রাক'আত পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা বলার ভাষা নেই। তারপর ৩ রাক'আত পড়তেন। আমি বললামঃ আপনি কি বিতর পড়ার পূর্বেই নিদ্রা যান। তিনি বললেনঃ হে আয়েশা ! আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায় কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. বলেনঃ

سألت عائشة رضي الله عنها عن صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالـت: كان ينام أول الليل ، ثم يقوم ، فإذا كان من السحر أوتر ، ثم أتى فراشه ، فإذا كان له حاجة ألم بأهله ، فإذا سمع الأذان وثب ، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء ، وإلا توضأ ، ثم خرج إلى الصلاة

একদা আমি আয়েশা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রির সালাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি বলেনঃ রাত্রির প্রথমাংশে তিনি নিদ্রা যেতেন। তারপর জাগ্রত হতেন। শেষ রাত হলে বিতর আদায় করতেন। এরপর বিছানায় যেতেন। অতঃপর যদি ফরয গোসলের প্রয়োজন হত তবে গোসল করতেন। তা না হলে, ওযু করতেন এবং সকালের সালাতের জন্য বের হতেন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৪। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে এত অধিক সময় দাড়িয়ে থাকতেন যে দু'পা ফুলে উঠত। তখন তাঁকে বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি এত ইবাদত করেন, অথচ আল্লাহপাক আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দ হব না?। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের দুনিয়ার নিম্নোক্ত জিনিসসমূহ আমার প্রিয় করে দেয়া হয়েছেঃ মেয়ে মানুষ, আতর এবং আমার চোখের শীতলতা দেওয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে। (বর্ণনায় আহমদ)

যাকাত ও ইসলামে তার গুরুত্ব

কিছু সংখ্যক লোকের উপর শর্ত সাপেক্ষে ও নিদিষ্ট সময়ে যাকাত ওয়াজিব। যাকাত হচ্ছে ইসলামের রোকনসমূহের একটা রোকন এবং তার ভিত্তি স্বরূপ আল্লহ তাআলা কোরআনের বহু আয়াতে সালাতের সাথে সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। উহা যে ফরয তার উপর মুসলমানদের ইজমা তথা ঐক্যমত কায়েম হয়েছে। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে তাকে অস্বীকার করবে, সে কাফের। ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করবে, বা কম করবে সে ঐসমস্ত জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্বন্ধে কঠিন আযাব ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

উপরোক্ত কথার দলীলসমূহঃ

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿١١٠﴾ ﴾ البقرة: ١١٠

সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সূরা আল-বাক্বারা ১১০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ ﴾ البينة: ٥

তাদেরকে তো এ হুকুম করা হয়েছে যে তারা সঠিক ভাবে ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। (সূরা আল-বাইয়েন্নাহ)

মায়ায বিন জাবাল রাঃ কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইয়ামানে পাঠান তখন তাকে যে উপদেশ দেন তার মধ্যে আছেঃ যদি তারা তোমার ঐ কথা মেনে নেয় তবে তাদের জানাবে, আল্লাহ তাদের উপর কিছু সাদাক্বাহ ফরয করেছেন। তা ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। (বর্ণনায় বুখারী)

যারা যাকাত আদায় করবে না, তারা যে কুফরি করল এ সম্বন্ধে আল্লাহপাক বলেনঃ

﴿ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ﴿١١﴾ ﴾ التوبة: ١١

যদি তারা তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে

তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। (সূরা আত-তাওবাহ ১১)
এই আয়াত হতে এ কথা পরিষ্কার হচ্ছে যে, যারা সালাত আদায় করবে না এবং যাকাত প্রদান করবে না তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই নয়। বরং তারা কাফির। এজন্য আবু বকর (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন যারা সালাত ও যাকাতকে আলাদা করেছিল এবং সালাত কায়েম রেখেছিল কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। আর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ঐ জিহাদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

যাকাতের হিকমত

যাকাতকে যে প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে বহু হিকমত রয়েছে। আর তার উদ্দেশ্য অনেক বড়, মানব কল্যাণও প্রচুর। যখন আমরা কোরআন ও হাদীস পর্যালোচলনা করব তখন এগুলো আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হবে। যাকাত কাকে কাকে দিতে হবে এ সম্পর্কে সূরা তাওবা এবং অন্যান্য আয়াতে ও হাদীসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সাদাক্বাহ (যাকাত) দেয়ার ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্ত ধরণের ভাল কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতেই আল্লাহ তাআলার হিকমতগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠে।

১। উহা মুমিনদের অন্তরকে নানা ধারণের পাপ-গুনাহ হতে পরিষ্কার করে এবং খারাপ কাজের প্রভাব হতে অন্তরকে পরিষ্কর করে। আর তার রুহকে কৃপণতার খারাবি এবং টাকা পয়সার প্রতি অত্যাধিক লোভ এবং এই লোভের কারণে অন্যান্য যে খারাবি হয় তা হতে অন্তরকে পবিত্র করে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴿١٠٣﴾ ﴾ التوبة: ١٠٣

তুমি তাদের মাল দৌলত হতে সাদাক্বাহ গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র কর এবং তাদের অন্তরকে সংশোধন কর। (সূরা তাওবা ১০৩)

২। গরীব মুসলিমদের সাহায্য করা, তাদের চাহিদা পূর্ণ করা, তাদের সহায়তা ও সম্মান করা যাতে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট সাহায্য চেয়ে নিজেদেরকে অপমান না করে।

৩। ঋণগ্রস্ত মুসলিমের ঋণ শোধ করে দিয়ে তার মনের পেরেশানী দূর করা এবং যারা ঋণভারে ভারাক্রান্ত তাদের বোঝা লাঘব করা।

৪। অন্তরকে ঈমান ও ইসলামের উপর শক্তিশালী করা, যাতে তারা বিভিন্ন ধরণের

সন্দেহ ও মনের ধোকা হতে বাঁচতে পারে (ঈমানের দৃঢ়তা আসার পূর্ব পর্যন্ত)। ফলে আস্তে আস্তে তাদের ঈমানের মধ্যে দৃঢ়তা আসবে এবং পরিপূর্ণ ইয়াক্বীন পয়দা হবে।

৫। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে তাদের প্রস্তুত করা। তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস ও হাতিয়ারের ব্যবস্থা করা। যাতে তারা ইসলাম প্রচার করতে পারে। আর কুফরি ও ফিৎনা ফাসাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। সাথে সাথে ন্যায়ের পতাকাকে মানুষের মাঝে সমুন্নত করতে পারে। ফলে সমাজে কোন ফিৎনা দেখা দেবে না, বরঞ্চ দ্বীন সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহর জন্যই হবে।

৬। যখন কোন মুসলিম মুসাফির, যাত্রা পথে বিপদে পড়ে এবং তার যাত্রার শেষে ঘরে ফিরার মত টাকা পয়সা না থাকে তখন তাকে ঐ পরিমাণ যাকাতের মাল দেয়া যাবে যা দিয়ে সে ঘরে পৌঁছতে পারে।

৭। সম্পদকে পবিত্র করা তাকে বৃদ্ধি ও হেফাজত করা এবং তাকে নানা ধরণের বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়ে কাখা। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও তাঁর হুকুমের উপর চলার বরকত পাওয়া যাবে এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা হবে।

এগুলো হচ্ছে যাকাত আদায়ের হিকমত এবং মহান উদ্দেশ্যের কয়েকটি। এ ছাড়া উহা আদায়ে আরও অনেক উপকার আছে। কারণ, শরীয়তের হুকুমের গোপন রহস্য ও হিকমত পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

যে সমস্ত মালের যাকাত দেয়া ওয়াজিব

চার প্রকার মালের যাকাত দেয়া ওয়াজিবঃ

প্রথমঃ- জমিনের ভিতর হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল বের হয় উহার যাকাত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ ﴿٢٦٧﴾ ﴾ البقرة: ٢٦٧

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সমস্ত পবিত্র জিনিস উপার্জন করছ তা হতে দান কর। আর জমিন থেকে আমি যে জিনিস বের করেছি তা হতেও। তবে এর মধ্য হতে শুধু খারাপ জিনিসগুলো দান করো না। যদি এ ব্যাপারে গাফিলতী না কর তবে তোমরা আর দোষী হবে না। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২৬৭)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ﴿١٤١﴾ الأنعام: ١٤١

আর তোমরা ফসলের হকসমূহ আদায় কর যেদিন ফসল কর্তন কর সেদিনই। (সূরা আল-আন'আম১৪১)

মালের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে যাকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভূগর্ভস্থ পানিতে উৎপন্ন হয় তার উপর দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যে ফসল সেচের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। (বর্ণনায় বুখারী)

দ্বিতীয়ঃ সোন, রূপা ও নগদ টকার যাকাত।

মাহান আল্লহ তাআলা বলেনঃ

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾ التوبة: ٣٤

যারা সোনা, রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। (সূরা তাওবা ৩৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم . فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره . كلما بردت أعيدت له . في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . حتى يقضى بين العباد .

যদি সোনা বা রূপর অধিকারী কোন ব্যক্তি উহাদের হক (যাকাত) ঠিকমত আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধাতুকে পাত বানিয়ে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, তারপর তা দিয়ে তার কপালে, শরীরের পার্শ্বে ও পিঠে ছেক দেয়া হবে। যতবারই ঠান্ডা হয়ে আসবে, ততবারই উহা গরম করে ছেক দেয়া হবে, এমন এক দিনে যা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এভাবেই এ আযাব চলবে যতক্ষণ না বান্দাদের বিচার শেষ হয়। (বর্ণনায় সহীহ মুসলিম)

তৃতীয়ঃ ব্যবসার মালের যাকাত।

উহা হচ্ছে ঐ সমস্ত মাল যা ব্যবসা বানিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন,

জায়গা জমিন, পশু, খাদ্য, পানিয়, গাড়ী ও এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ। ব্যবসায়ী যখন তার বছর শেষ হবে তখন সমস্ত মালের দাম হিসাব করবে। তারপর যে দাম আসে তার চল্লিশ ভাগের এক অংশ বের করবে, খরিদা দামে হোক বা তার চেয়ে কমবেশী যাই হোক ঐ জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করবে। ঐ সমস্ত মুদি, গাড়ী, টায়ার টিউব ইত্যাদি সব হিসাব করবে। প্রত্যেক দোকানদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাদের, দোকানে ছোট বড় জিনিস যা আছে তার তালিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করা। তারপর ঐ হিসাব মত যাকাত আদায় করা। তবে হাঁ, যদি এই কাজ তার উপর খুবই কষ্ট দায়ক হয় তবে একটা পরিমাপ করে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

চতুর্থঃ গবাদি পশু

উহাদের মধ্যে শামিল হল গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। তবে এতে শর্ত হল, এগুলো মাঠে চরা পশু হতে হবে এবং এগুলোর দুধ কিংবা আর্থিক লাভের জন্য পালন করা হবে। আর তাদের নেসাব পূর্ণ হতে হবে। মাঠে চরার শর্ত হল, সমস্ত বছর বা বছরের বেশীর ভাগ সময় চরতে হবে। তা যদি না হয় তবে আর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যদি ব্যবসায়ের জন্যে প্রতিপালন করা হয়, তবে যাকাত দিতে হবে। যদি তাদের পালন করা হয় ব্যবসার জন্য তবে তা মাঠেই চরানো হোক কিংবা ঘরেই ঘাস খাক, তার যাকাত হবে ব্যবসার জিনিসের মতই। ব্যবসার এই নেসাব হয় হুবুহু ঐ মালেই হবে অথবা অন্য জিনিসের সাথে মিলিয়ে হতে হবে।

যাকাতের নেসাবের পরিমাণ

১। ফসল ও ফলঃ এর নেসাব হল পাঁচ আওসাক বা ৬১২ কেজি (কিলোগ্রাম)। যদি সেচ ছাড়াই উৎপাদিত হয় তখন দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা উৎপন্ন হলে ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

২। নগদ টাকা বা সোনা, রূপা ইত্যাদির যাকাতঃ-

(ক) সোনাঃ- ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম পরিমাণ ওজন হলে তাতে ৪০ ভাগের এক ভাগ অর্থাত শতকরা ২.৫০ (আড়াই) ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে। (খ) রূপাঃ- উহা যখন ৫৯৫ গ্রাম হবে তখন শতকরা ২.৫০ (আড়াই) ভাগ যাকাত দিতে হবে।

(গ) নগদ টাকাঃ- উহা সোনা বা রূপা যে কোন একটার নেসাবের সমান নগদ টাকা থাকলেই যাকাত দিতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ।

৩। ব্যবসার মালঃ- সোনা রূপার হিসাবে দাম হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা দিতে হবে।

৪। গবাদী পশুঃ-
(ক) উটঃ- উহার সর্ব নিম্ম পরিমাণ হল ৫ টা উহাতে যাকাত দিতে হবে ১টা ছাগল।
(খ) গরুঃ- উহার সর্ব পরিমাণ হল ৩০ টা। উহাতে যাকাত দিতে হবে ১ বছরের একটি বাছুর।
(গ) ছাগলঃ- উহার সর্ব পরিমাণ হল ৪০ টা উহাতে দিতে হবে ১ টা ছাগল।
এসমস্ত পশুর নেসাব ও যাকাত সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে ফিকাহ এর কিতাব দেখতে হবে।
পশুর উপর তখন যাকাত ওয়াজিব হবে যখন এগুলো পুরো বছর মাঠে চরে খাবে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১। ইসলামঃ- যাকাত কাফির বা মুরতাদের উপর ওয়াজিব নয়।
২। যে মালের যাকাত দিতে হবে তাতে তার পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। তা তার হাতের মধ্যে থাকতে হবে আর তা খরচ করার পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে অথবা কেউ নিলেও তা ফেরত পাবার পূর্ণ অধিকার থাকবে।
৩। নেসাব পূর্ণ হতে হবেঃ- শরীয়তে বিভিন্ন মালের জন্য যে নেসাব দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ হতে হবে।
৪। বছর পূর্ণ হতে হবেঃ- যেদিন থেকে সে নেসাবের মালিক হল সেদিন হতে এক বছর পূর্ণ হতে হবে। তবে গবাদি পশুর বংশ বৃদ্ধি পেলে এবং ব্যবসার লাভ হলে তা মূলের সাথে সংযুক্ত হবে।
৫। স্বাধীনতাঃ- কোন দাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ সে কোন সম্পদের অধিকারী নয়, বরং সে তার মালিকের সম্পদ দেখাশুনা করে।
৬। ঐ গবাদি পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না যা মালিক নিজ সম্পদ দ্বারা প্রতিপালন করেন। যেমন, পশুকে যদি তার খাদ্য কিনে খাওয়াতে হয় তাহলে ঐ পশুর উপর যাকাত হবে না।

যাকাত কোথায় ও কাকে দিতে হবে

যাকাত কোথায় ব্যয় করতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ-

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

﴿ ٦٠ ﴾ التوبة: ٦٠

সদক্বা পাবার যোগ্য শুধুমাত্র ফকীর, মিসকীন, যাকাত সংগ্রহকারী, যাদের অন্তর (ইসলামে) ঝুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে, আর ক্রীতদাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তরা, আর যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আছে, আর রাস্তার পথিক (মুসাফীর)। ইহা আল্লাহর তরফ হতে ফরয। আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছু জ্ঞাত আছেন, আর তিনি হিকমত ওলা। (সূরা তাওবা ৬০)

(সদক্বাহ বলতে এ আয়াতে ফরয যাকাতকে বুঝাচ্ছে) আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ৮ ধরণের লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের প্রত্যেকেই যাকাত পাওয়ার অধিকার রাখে।

১। ফকিরঃ- ঐ ব্যক্তি, তার যা প্রয়োজন, তার অর্ধেকেরও তিনি মালিক নন। অথবা তার থেকেও কম। তিনি মিসকীনের চেয়েও বেশী অভাবী।

২। মিসকীনঃ- এমন অভাবী ব্যক্তি যার অবস্থা ফকিরের চেয়ে ভাল। যেমন তার প্রয়োজন ১০ টাকার, তার নিকট আছে ৭ টাকা। ফকির তাকে বলা হয়, যে মিসকীনের থেকেও বেশী অভাবী। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ ﴿٧٩﴾ ﴾ الكهف: ٧٩

আর ঐ নৌকা যা ছিল কয়েকজন মিসকিনের, যারা সমুদ্রে কাজ করত। (সূরা কাহাফ ৭৯)

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদেরকে মিসকিন বলেছেন যদিও তারা একটা নৌকার মলিক ছিল। ফকির ও মিসকিনদের এই পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তাদের পুরা বছর চলে যায়। কারণ, যাকাত প্রত্যেক বছরই ওয়াজিব হয়, তাই সে পূর্ণ এক বছরের মাল নেবে।

কতটা সাহায্য প্রয়োজনঃ- উহাতে শামিল হল খানা, পোশাক, বাসস্থান এবং অন্যান্য জিনিস যা ছাড়া বাঁচা সম্ভবপর নয়, তবে কোন অতিরিক্ত খরচ করা চলবে না। আর যার নিকট হতে সে যাকাত পাবে তার উপর সে বোঝা স্বরূপ হতে পারবে না। এ জন্য এই পরিমাণ এক এক যামানায়, এক এক এলাকায় ও ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়। যা এখানে এক ব্যক্তির চলে অন্যত্র হয়ত অন্য ব্যক্তির তাতে চলবে না। যা হয়ত অনেকের ১০ দিনের জন্য যথেষ্ট, তা হয়ত অন্য কারো এক দিনের খরচ। যাতে এই ব্যক্তির চলে তাতে অন্যের চলবে না। কারণ তার পারিবারিক খরচ বেশী।

আলেমগণ ফতোয়া দেন যে, পূর্ণ প্রয়োজনীয়তার মধ্যে শামিল আছে, রুগীর চিকিৎসা, অবিবাহিতের বিবাহ, কিতাব পত্র খরিদ ইত্যাদি।
ফকির ও মিসকিনদের মধ্যে যারা যাকাত নিবে তাদের অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। বনু হাশেম এবং তাদের সাথে সংযুক্ত লোকেরা যাকাত নিতে পারবে না। আর যাদের উপর খরচ করা তার জন্য লাযেম তাদের যাকাত দেয়া যাবে না। যেমন পিতা-মাতা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী। আর যার পক্ষে উপার্জন করার মত শক্তি আছে, তার জন্য যাকাত নেয়া জায়েয নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ধনী বা কর্মক্ষম যারা তাদের এতে কোন অংশ নেই। (বর্ণনায় আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)
যাকাত আদায়কারীঃ- তারা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তিবৃন্দ যাদেরকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নায়েব নিদিষ্ট করে দিয়েছেন যাকাতের মাল সম্পদ সংগ্রহ করা, হেফাজত করা এবং তা বন্টন করার জন্য। তাদের মধ্যে আছে যাকাতের সম্পদ সংগ্রহকারী, হেফাজতকারী, লেখক, হিসাবরক্ষক, পাহারাদার, একস্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহনকারী, এবং যারা উহা বিলি-বন্টন করে তারাও।
তাদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী বেতন দেয়া হয়, সে ধনী হলেও। যদি সে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী এবং কর্মপটু হয়। যদি তিনি বনু হাশেম গোত্রের হন তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই যাকাত ও সদক্বাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধরদের জন্য নয়। (বর্ণনায়: মুসলিম)
৪। যাদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুকছেঃ তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরা যাদেরকে বংশের লোকেরা মান্য করে এবং আশা করা যায় যে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। অথবা তার ঈমানী শক্তি এবং ইসলাম গ্রহণ উদাহরণ হবে অন্যদের সম্মুখে, অথবা মুসলিদের রক্ষা বা তার ক্ষতি হতে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। তাদের সাহায্য করা এখনও চলছে, এটা মনসুখ (বাতিল) হয়নি। তাদেরকে যাকাত হতে এই পরিমাণ মাল দেয়া হবে যাতে তারা ইসলামের প্রতি ঝুকে পড়ে, তাকে সাহায্য করে এবং কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তার বিরোধিতা করে। এই অংশ কাফেরকে ও দেয়া চলে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে হুনাইন যুদ্ধের গনিমত দিয়েছিলেন। আর এটা মুসলিমকেও দেয়া চলে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সূফইয়ান ইবনে হারবকে দিয়েছিলেন। এমনি ভাবে আকরা বিন হাবেসকেও দিয়েছিলেন। তারপর উয়াইনাহ্ ইবনে হিসানকেও দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি একশত করে উট

দিয়েছিলেন। (বর্ণনায় মুসলিম)
৫। ক্রীতদাস মুক্তিতেঃ- এর মধ্যে শামিল আছে দাসদের মুক্ত করা। যারা মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিনামা লিখেছে তাদের ও সাহায্য করা। তারপর যারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, তাদের মুক্ত করা। কারণ, এ ব্যক্তি ঐ ঋণগ্রস্তদের দলে শামিল হবে যাকে ঋণের বোঝা হতে মুক্ত করা হয়। তাকে আরো বেশী সাহায্য করা উচিত, এজন্য যে, হয়ত শত্রুরা তাকে হত্যা করবে অথবা অত্যাচারের কারণে সে ইসলাম ত্যাগ করবে।
৬। ঋণগ্রস্তঃ- তারা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তিরা যারা দেনা করেছেন এবং শোধ করার ওয়াদা করেছেন। দেনা দুই রকমের হতে পারেঃ-
(১)কোন ব্যক্তি তার জায়েয প্রয়োজনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। যেমন তার খরচ চালানোর অথবা পোষাক ক্রয় বা বিয়ে বা চিকিৎসার জন্য, অথবা বাড়ী নির্মাণ বা আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ করেছে। অথবা অন্য কোন জিনিস ভূলক্রমে অথবা বেখেয়ালে নষ্ট করেছে। তখন তাকে ঐ পরিমাণ টাকা দেয়া হবে। যাতে সে ঋণমুক্ত হতে পারে। হয়ত সে আল্লাহ তাআলার কোন হুকুম পালনের জন্য মুবাহ্ কোন কাজ করার জন্য ঋণ করেছে।
এই দলে শামিল হতে হলে তাকে মুসলিম হতে হবে, এমন ধনী হওয়া চলবে না যাতে সে তার ঋণ নিজেই শোধ করতে পারে। তার ঋণ গ্রহণ কোন পাপ কাজের জন্য হয়নি।
(২) অপরের উপকার করতে ঋণগ্রস্ত হওয়াঃ যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে আপোষ করতে। আর এই ক্ষেত্রে যাকাতের টাকা নেয়া যাবে। কারণ কুবাইসাহ বিন হিলালী (রাঃ) বলেনঃ আমি কোন ব্যক্তির ঋণের বোঝা গ্রহণ করেছিলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি এখানেই থেকে যাও যতক্ষণ না আমাদের নিকট যাকাত সাদাক্বার টাকা আসে। তখন তোমার ঋণ শোধের জন্য মাল দিতে বলব।
তারপর বললেনঃ হে কুবাইসাহ! অন্যের কাছে ভিক্ষা করা তিন ধরণের লোক ছাড়া অন্যের জন্য জায়েয নয়। যখন কোন ব্যক্তি অন্যকে উপকার করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে তখন তার জন্য অন্যের নিকট চাওয়া বৈধ। যখন উহা শোধ হয়ে যাবে, তখন আর চাইবে না।
(দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যার এত বেশী প্রয়োজন পড়েছিল যে, টাকা ধার ছাড়া চলে না, তখন তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল যাতে করে সে কোনক্রমে

বাঁচতে পারে।
(তৃতীয়) ঐ ব্যক্তি যাকে অভাব পাকড়াও করেছে। তারপর অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, তার কাওমের কমপক্ষে তিন জন লোক বলেছে সত্যিই ঐ ব্যক্তি অন্নকষ্টে পড়েছে। তখন বাঁচার তাগিদে তার জন্য সাওয়াল করা জায়েয হবে। এর বাইরে যে সমস্ত ভিক্ষা করা হবে, কুবাইসা! তা হারাম। এ ধরণের সাওয়ালকারী হারাম দ্বারা পেট পূর্ণ করে। (বর্ণনায় মুসলিম ও আহমদ)
যাকাতের মাল দিয়ে মৃত ব্যক্তির ঋণও শোধ করা যায়। কারণ এক্ষেত্রে মালিকত্ব শর্ত নয়। এ ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদের পক্ষে যাকাত নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের জন্য নয়।
৭। আল্লাহর রাস্তায়ঃ- ঐ সমস্ত লোক যারা দ্বীনের কাজ করে, সরকারী তহবিল হতে কোন বেতন পায় না। এই দলে গরীব ও ধনী উভয়েই শরিক হবে। এতে আরো আছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তারাও। এতে অন্যান্য উত্তম কাজ শামিল হবে না। কারণ, আয়াতে এই দলকে আলাদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে পূর্বের দলগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।
আল্লাহর রাস্তায় সমস্ত ধরণের জিহাদ শামিল হবে। যেমন চিন্তাভাবনার দ্বারা জিহাদ, যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি। আর যারা নানা ধরণের সন্দেহের দোলায় ডুলছে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য যারা চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় তারাও। যে সমস্ত ধ্বংসকারী দল ইসলামের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে তারাও জিহাদ করে বলে গণ্য। যেমন প্রয়োজনীয় ইসলামী গ্রন্থ ছাপিয়ে বিলি করা, ভাল বিশ্বাসী ও মুখলিস লোকদের নিযুক্ত করা যার খৃষ্টান ও নাস্তিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করবে।
কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর জান, মাল এবং কথার দ্বারা।
(বর্ণনায় আবু দাউদ)
৮। রাস্তার পথিকঃ- ঐ মুসাফির, যে তার দেশ হতে অন্য দেশে গেছে, কিন্তু টাকার অভাবে নিজ গৃহে ফেরত যেতে পারছে না। তাকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবে যা দ্বারা সে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, তার এই সফর কোন পাপের জন্য হতে পারবে না।
বরং কোন ওয়াজিব, মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজের জন্য হতে হবে। আরও শর্ত

হল, যদি সে কোথাও থেকে কর্জ পায় তবে সে যাকাত নিতে পারবে না। ঐ ধরণের মুসাফির যারা বহুদিন অন্য দেশে থাকে, তার কোন প্রয়োজনে, তাকেও যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

পরিশিষ্টঃ

যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে উপরক্ত সমস্ত ধরণের লোকদেরই দিতে হবে তা শর্ত নয়। বরঞ্চ মুস্তাহাব হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা দেখে আদায় করা। এটা লক্ষ্য করবেন দেশের সরকার প্রধান, তার প্রতিনিধি বা যিনি যাকাত দিবেন তিনি।

কারা যাকাত পাবার যোগ্য নয় ?

১। ধনী ও যারা কর্মক্ষম।

২। যাকাত দানকারীর বাপ, দাদা সন্তান-সন্ততী এবং স্ত্রী।

৩। অমুসলিম

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর

যদি বাপ, মা এবং সন্তান-সন্ততী দরিদ্র হন এবং তারা আলাদা বসবাস করেন তবে তাদের যাকাত দেয়া যাবে। আর তিনি যদি তাদের ভরণ পোষণে অসমর্থ হন তখন তাদের খরচ চালান তার উপর ওয়াজিব নয়। সমস্ত ধরণের আত্নীয়-স্বজনদের যাকাত দেয়া যাবে তবে শর্ত হল তার মূল। (বাপ, দাদা) ও শাখা প্রশাখা (সন্তান-সন্ততী) হতে পারবে না।

আর বনী হাশেমদের তখন দেয়া যাবে যখন তারা গনীমতের মাল পাবে না। তখন তাদের হাজত ও জরুরত দেখে দেয়া হবে।

যাকাত আদায়ের উপকারিতা

১। আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম প্রতিপালন করা। আর আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভালবাসেন তাকে মালের প্রতি যে নফসের ভালবাসা আছে তার উপর প্রধান্য দেয়া।

২। এই আমলের বিনিময় বহুগুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ ﴿٢٦١﴾ ﴾ البقرة: ٢٦١

261

যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ শষ্য দানার মতো যার থেকে সাত টা শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষে শতাধিক দানা হয় আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বাড়িয়ে দেন। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২৬১)

৩। সাদাক্বাহ তার ঈমানের প্রমাণ স্বরূপ এবং তার ঈমানের নিদর্শন। হাদিস শরীফে আছেঃ

الصدقة برهان (رواه مسلم)

"সাদাক্বাহ বোরহান (দলীল) স্বরূপ (বর্ণনায় মুসলিম)

৪। ইহা মানুষকে পাপের ও চরিত্রের খারাবী হতে পবিত্র করে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴿١٠٣﴾ ﴾ التوبة: ١٠٣

আপনি তাদের মাল সম্পদ হতে সাদাক্বাহ গ্রহণ করুন যাতে তারা পাক পবিত্র হয়। (সূরা তাওবা ১০৩)

৫। সম্পদের বৃদ্ধি, বরকত হওয়া, হেফাজত ও খারাবী থেকে বেঁচে থাকা সমস্তই ঘটে যাকাত আদায়ের কারণে। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সাদাক্বাহ্ দেয়ার কারণে সম্পদ কমেনা"। (বর্ণনায় মুসলিম)

মহান আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾ سبأ: ٣٩

তোমরা যা দান করনা কেন তা ফেরত পাবে, কারণ আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (সুরা সাবা ৩৯)

৬। কিয়ামতের দিন সাদক্বাহকারী তার ছায়াতলে থাকবে। ঐ হাদিসে উল্লেখ হয়েছেঃ সাত ধরণের লোক আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া পাবে, যেদিন ঐ ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না, তাতে আছেঃ ঐ ব্যক্তি যিনি দান খয়রাত করেন এত গোপনে যে ডান হস্ত যা দান করে বাম হস্ত ও তা জানে না। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৭। উহার কারণে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿١٥٦﴾ ﴾ الأعراف: ١٥٦

আমার রহমত সমস্ত জিনিসের উর্দ্ধে, আর আমি উহা লিখব ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যাকাত আদায় করে। (সূরা আল-আ'রাফ ১৫৬)

যারা যাকাত দেয় না তাদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী

১। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ التوبة: ٣٤ - ٣٥

যারা সোনা, রূপাকে জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধাতুকে গরম করে উহা দ্বারা তাদের কপালে, শরীরে পার্শ্বে ও পিঠে ছেক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) ইহা হচ্ছে ঐ সম্পদ জমানোর শাস্তি যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছিলে নিজেদের জন্যে। আর ঐ জিনিস সঞ্চয় রাখার শাস্তি গ্রহণ কর।

(সূরা তাওবা ৩৪-৩৫)

২। আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم . فيجعل صفائح . فيكوى بها جنباه وجبينه . حتى يحكم الله بين عباده . في يوم

كان مقداره خمسين ألف سنة . ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر . كأوفر ما
كانت . تستن عليه . كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها . حتى
يحكم الله بين عباده . في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . ثم يرى
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .

সম্পদের অধিকারী কোন ব্যক্তি যদি যাকাত না দেয় তবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত জিনিসকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে পাত বানান হবে। তারপর উহা দ্বারা তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও অন্যান্য অঙ্গে ছেক দেয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা বিচার শেষ করেন। আর ঐ দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তারপর তার নিদিষ্ট স্থান হবে হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম।

৩। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সম্পদের অধিকারী করেছেন, তিনি যদি যাকাত আদায় না করেন তবে ঐ সম্পদকে এক শক্তিশালী টাক মাথা, দুইশিং ওয়ালা সাপ রূপে উঠান হবে, যা তাকে কিয়ামতের দিন আঘাত করতে থাকবে। তারপর তাকে দাঁত দিয়ে কামড়াবে ও বলবেঃ আমি তোমার মাল, আমি তোমার গুপ্ত সম্পদ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করেনঃ

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١٨٠﴾ ﴾ آل عمران: ١٨٠

তুমি কক্ষণই ধারণা করনা যে, যাদের আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন তারা যদি তাতে কৃপণতা করে তবে তা তাদের জন্য উত্তম। বরং উহা তাদের জন্য নিকৃষ্ট। উহা তার ঘাড়ে ঝুলান হবে কিয়ামাতের দিন, সে যে বখিলী করেছে তার শাস্তি স্বরূপ। (সূরা আলে ইমরান ১৮০)

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ যাদেরকে উট,

গরু বা ছাগলের অধিকারী করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের যাকাত আদায় করেনি, তখন ঐ পশুদের কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে আরও বড় ও মোটা করে। তখন তারা তাদের মালিককে শিং দ্বারা ও পা দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখন একটি ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন অন্যটি শুরু করবে। আর এটা চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না বিচার শেষ হয়। (বর্ণনায় মুসলিম)

যাকাত সম্পর্ক কিছু প্রয়োজনীয় কথা

প্রথমঃ উপরে উল্লিখিত আট দলের যে কোন এক দলকে যাকাত দিলেও উহা সহীহ হবে। যদিও তাদের প্রতিটি দলই পাওয়ার যোগ্য তবু তাদের প্রত্যেক দলকে যাকাত দেয়াটা ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয়ঃ- যে ঋণভারে জর্জরিত তাকে এমন পরিমাণে যাকাত দেয়া চলে যাতে সে পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে ঋণমুক্ত হতে পারে।

তৃতীয়ঃ- যাকাত কোন কাফেরকে দেয়া যাবে না। সে মূলেই কাফের হোক বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হোক। তেমনিভাবে সালাত ত্যাগকারীকে যাকাত দেয়া যাবে না। কারণ তার ব্যাপারে সঠিক ফতোয়া হল সে কাফের। তবে সে যদি সালাত আদায় করতে রাজী হয় তবে তকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

চতুর্থঃ- কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (উহাতে (যাকাতে) কোন ধনী বা কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই) (বর্ণনায় আবু দাউদ)

পঞ্চমঃ- ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া জায়েয হবে না যাদের ভরণ পোষণের ওয়াজিব দায়িত্ব তার উপর আছে। যেমন পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রী।

ষষ্ঠঃ - যদি স্বামী দরিদ্র হন তবে ধনী স্ত্রী তাকে যাকাত দিতে পারে। কারণ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী তাঁকে যাকাতের মাল প্রদান করেছিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অনুমোদন করেছিলেন।

সপ্তমঃ- এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া উচিত নয়। অবশ্য যদি সেই রকম প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে দেয়া যেতে পারে।

যেমনঃ দুর্ভিক্ষ অথবা ঐ দেশে কোন দরিদ্র ব্যক্তি না মিললে অথবা মুজাহিদদের সাহয্যের করার প্রয়োজন হলে। অথবা দেশের শাসক কোন

জরুরী প্রয়োজনের খাতিরে উহা করতে পারে।
অষ্টমঃ- যদি কেউ অন্য কোন দেশে যেয়ে সম্পদের অধিকারী হয় তবে সেই দেশেই যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। তিনি উহা তার নিজের দেশে প্রেরণ করতে পারবেন যদি উপরোক্ত জরুরী কারণসমূহের কোনটা দেখা দেয়।
নমবঃ- কোন ফকিরকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া জায়েয যাতে তার পুরো বছর বা কয়েক মাসের চাহিদা মিটে।
দশমঃ- সোনা ও রূপার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে সর্বাবস্থাতেই যদিও উহা টাকা হিসাবে বা অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হউক বা অন্যকে ধার দেয়া হউক অথবা অন্য কোন অবস্থাতেই উহা থাকুক না কেন। কারণ, সাধারণভাবে যে সমস্ত দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে উহাই প্রমাণিত হয়। তাবে কোন কোন আলেম বলেছেন, যে গহনা পরিধান করা বা ধার দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাতে যাকাত নাই। তবে প্রথম দলের কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য আর তার উপর আমল করাই সঠিক হবে।
একাদশঃ- ঐ সমস্ত জিনিস যা কেহ কোন নিজ প্রয়োজনের জন্য জড়ো করে তাতে যাকাত নেই। যেমন খাদ্য, পানীয়, বিছানা, বাড়ী, গবাদি পশু, পোশাক পরিচ্ছদ, গাড়ী ইত্যাদি। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলিমের উপর তার দাস ও ঘোড়ার যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) আর এর ব্যতিক্রম হল শুধুমাত্র পরিধান করার সোনার ও রূপার গহনা পত্র।
দ্বাদশঃ- যে সমস্ত বাড়ী-ঘর, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি ভাড়ায় খাটান হয় তাদের যাকাত হবে তাদের ভাড়ার মধ্যে যদি উহা নগদ টাকায় মিলে এবং তাতে এক বছর পূর্ণ হয়, যদি উহার পরিমাণ নিজে নিজে নেসাব পরিমাণ হয় অথবা ঐ টাকা অন্য টাকর সাথে মিশে নেসাব পরিমাণ হয়।
(বিঃ দ্রঃ যাকাতের এই অংশ কিছুটা পরিবর্তন করে শেখ আবদুল্লাহ বিন সালেহ এর কিতাব হতে গ্রহণ করেছি) - লিখক

সিয়াম ও তার উপকারিতা

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾ البقرة: ١٨٣

হে ঈমানদারগণ! সিয়ামকে তোমাদের উপর তেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বের যামানার লোকদের উপর করা হয়েছিল, যাতে করে তোমরা মুত্তাক্বী (আল্লাহভীরু) হতে পার। (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الصيام جنة (وقاية من النار)

সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ অর্থাৎ জাহান্নাম হতে রক্ষাকারী। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري : ٢٠١٤،مسلم : ١٨١٧

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পূণ্যের আশায় সিয়াম পালন করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২। তিনি আরও বলেনঃ

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. مسلم:١٩٨٤

যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করে অতঃপর শাওয়ালে ও ছয়টি রোযা রাখে সে যেন পুরা বছর রোযা রাখল। (বর্ণনায় মুসলিম)

৩। তিনি আরও বলেনঃ

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . مسلم:١٧٣

যে ব্যক্তি রমযানে তারাবিহর সালাত আদায় করে ঈমানের সহিত পূন্যের আশায়, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

হে আমার মুসলিম ভাই ! জেনে রাখুন, সিয়াম একটি ইবাদত এবং এর রয়েছে নানা প্রকারের উপকারিতা। তম্মধ্যে-

(১) সাওম হজমের যন্ত্র ও পাকস্থলীকে সর্বদা কার্যে লিপ্ত হওয়া হতে

বিরতি দান করে এবং শরীরের যে বর্জ্য পদার্থ আছে তাকে নিঃসরণ করে। শরীরে শক্তি যোগায় আর উহা নানা ধরণের রোগের ও নিরাময় দান করে। আর ধূমপায়ীকে ধূমপান হতে দিবসের সময়টা বিরত রাখে। এইভাবে আস্তে আস্তে তাকে উহা ত্যাগ করতে সাহায্য করে।

(২) উহা নফস বা আত্মাকে সুস্থ করে তোলে। ফলে উহা নানা ধরণের নিয়ম শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যেমন আনুগত্য, সবর, ইখলাস।

(৩) সাথে সাথে আদায়কারী নিজেকে তার অন্যান্য সিয়াম আদায়কারী ভাইদের সমকক্ষ মনে করে। কারণ তাদের সাথে একত্রেই সিয়াম শুরু করে এবং ইফতার ও করে। ফলে সবাই ইসলামের একত্ববাদের উপর এসে যায়। সাথে সাথে সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করে তাতে তার অন্যান্য ক্ষুধার্ত ও অভাবী ভাইদের কষ্ট অনুভব করতে পারে।

রমযানে আপনার উপর জরুরী ওয়াজিবসমূহ

হে মুসলিম ভাই! জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করেছেন এজন্য যে, উহা আদায়ের মাধ্যমে আমরা তাঁর ইবাদত করব। যাতে করে আপনার সিয়াম কবুল ও উপকারী হয় তজ্জন্য নিম্মোক্ত আমলসমূহ আদায় করুনঃ-

১। সালাতকে হেফাজত করুন। বহু সিয়াম পালনকারী আছে যারা সালাতকে অবহেলা করে। উহা হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি। উহাকে ত্যাগ করা কুফুরি তূল্য।

২। আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হোন এবং কুফরি ও দ্বীনের প্রতি গালিগালাজ করা হতে সাবধান হোন। আর সাথে সাথে অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হতে বিরত হোন এই কথা বলে যে, আমি সিয়াম পালনকারী। এভাবেই সিয়াম নফসকে সুসামঞ্জস্য করে তুলে। আর চরিত্রের খারাপ দিকটা দূরীভূত করে। আর কুফরি কাজ করা হতেও বিরত রাখে যা মুসলিমদের দ্বীন হতে বের করে দেয়।

৩। সিয়াম অবস্থায় কোন আজে বাজে কথা বলবেন না, যদিও উহা হাস্যচ্ছলেই বলা হোক না কেন, কারণ উহা আপনার সিয়ামকে নষ্ট করে। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি কেহ সিয়াম পালনকারী হও তবে সে যেন আজে বাজে কথা বলা হতে বিরত থাকে আর যেন কর্কশভাষী না হয়। যদি কেহ তাকে গালি দেয় বা হত্যা করতে

উদ্যত হয় তবে সে যেন বলে আমি সিয়াম পালনকারী, আমি সিয়াম পালনকারী। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৪। সিয়ামের দ্বারা ধূমপান ত্যাগে অগ্রণী হোন। কারণ উহা ক্যান্সার, হাপানী ইত্যাদি রোগের কারণ। নিজকে আস্তে আস্তে দৃঢ় ইচ্ছার মালিক করে তুলুন। যেমনিভাবে উহাকে দিবসে পরিহার করেছেন তেমনিভাবে রাত্রিতেও পরিত্যাগ করুন। আর এর ফলশ্রুতিতে আপনার শরীর ও সম্পদ উভয়ই রক্ষা পাবে।

৫। আর যখন ইফতার করবেন তখন অতি ভোজন করবেন না। এটা সিয়ামের উপকারিতা নষ্ট করে দেয়। আর আপনার স্বাস্থ্য এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬। সিনেমা ও টেলিভিশন দেখা হতে বিরত হোন। কারণ উহাতে চরিত্র নষ্ট হয় আর সিয়ামের উপকারিতাও নষ্ট করে।

৭। বেশী বেশী রাত্রি জাগরণ করবেন না। ফলে হয়ত সেহেরী খাওয়া ও ফজরের সালাত আদায় করা হতে বাদ পড়ে যাবেন। আর আপনার উপর জরুরী হচ্ছে সকাল সকাল সব কাজ শুরু করা। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেনঃ (হে আল্লাহ্ ! আমার উম্মতের সকালের সময়ে বরকত দান করুন। (বর্ণনায় আহমদ ও তিরযি)

৮। বেশী বেশী করে নিজের আত্মীয় স্বজন ও অভাবীদের দান সদক্বাহ করুন। আর নিকট আত্মীয়দের বাড়ী বেড়াতে যান এবং শত্রুতা পোষণকারীদের মধ্যে সম্প্রতি সৃষ্টি করুন।

৯। বেশী বেশী করে আল্লহর জিকির করুন, তিলাওয়াত করুন বা শ্রবন করুন। আর উহার অর্থ অনুধাবন করতে সচেষ্ট হোন। তার উপর আমল করুন। আর মসজিদে যেয়ে উপকারী দরসসমূহ শ্রবণ করুন।

আর রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে এতেকাফ করুন।

১০। সাথে সাথে সিয়ামের উপর লিখিত কিতাবসমূহ ও অন্যান্য কিতাব ও পাঠ করুন। যাতে উহার হুকুম আহকাম শিক্ষা করতে পারেন। তখন শিখতে পারবেন, ভুলক্রমে খানা গ্রহণ করলে বা পানীয় পান করলে সিয়াম নষ্ট হয় না। আর রাত্রে গোসল ফরজ হলে উহা সিয়ামের কোন ক্ষতি করে না। যদিও ওয়াজিব হল পবিত্রতা হাসেল করা ও সালাতের জন্য গোসল করা।

১১। রমজানে সিয়ামের হেফাজত করুন। আর আপনার সন্তানদের

যখনই সামর্থ্য হবে তখন হতেই সিয়াম আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলুন। রমজানে বিনা ওযরে সিয়াম ত্যাগ করার ব্যাপারেও তাদের সাবধান করুন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একদিন সিয়াম ভঙ্গ করবে তার জন্য ওয়াজিব হল উহার কাজা আদায় করা ও তওবা করা। আর যে ব্যক্তি রমজানের দিবসে স্ত্রী সহবাস করবে সে তার কাফফারা আদায় করবে ক্রম অনুযায়ী। প্রথমে কোন ক্রীতদাস মুক্ত করা, আর যে উহা করতে সমর্থ হবে না সে যেন একাধারে দুই মাস সিয়াম আদায় করে। আর যে উহাতেও সমর্থ হবে না সে যেন ষাট জন মিসকিনকে খাদ্য দান করে।

১২। হে মুসলিম ভাই! রমজানে সিয়াম ভঙ্গ করা হতে সাবধান হোন। আর কোন ওযর বশতঃ করলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবেন না। কারণ, সিয়াম ভঙ্গ করা আল্লাহর সামনে বাহাদুরী দেখানোরই সমতূল্য। আর ইসলামকে করা হয় হেয় প্রতিপন্ন। আর মানুষদের মধ্যে খারাপ প্রভাব ছড়ায়। জেনে রাখুন, যে সিয়াম আদায় করল না তার ঈদও নাই। কারণ, সিয়াম পূর্ণকরার পর ঈদ হল আনন্দের দিবস। আর উহা এবাদত কবুলের দিবসও বটে।

সিয়াম সম্পর্কে কিছু হাদীস

ফাজায়েলে রমযান

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وفي لفظ (وسلسلت الشياطين). رواه مسلم: ٢٥٤٧

“যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ করা হয়।“

অন্য রেওয়াতে আছেঃ “যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।”

অন্য রেওয়াতে আছে - “তখন রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়”। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২। তিরমিযির রেওয়াতে আছেঃ

وينادي مناد يا باغي الخير أقبل! ويا باغي الشر أقصر! ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة.

“এক ঘোষক এই বলে ডাকতে থাকে, হে ভাল কার্য সম্পাদনকারীগণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো। আরও বলে, হে খারাপ কার্য আমলকারীরা পিছিয়ে যাও। আর আল্লাহপাক জাহান্নাম হতে বান্দাদের মুক্তি দিতে থাকেন। উহা প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না রমযান শেষ হয়। (হাসান)

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالـها إلى سبع مئة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به . . . مسلم:١١٥١

আদম সন্তানের প্রতিটি আমলকেই বর্ধিত করা হয়। প্রতিটি নেক আমলকে দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আর আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ “একমাত্র সিয়াম ব্যতীত। কারণ উহা একমাত্র আমার জন্য এবং উহার বদলা আমিই দেব। বান্দা তার শাহওয়াত এবং খাদ্য গ্রহণকে একমাত্র আমার জন্য ত্যাগ করে। সিয়ামকারীর জন্য দুটি আনন্দের সময় আসেঃ ইফতার করার সময় এবং তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লহর কসম! সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধী হতেও প্রিয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

জিহ্বাকে সংযত রাখা

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه .البخاري:٦٠٥٧

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা, অন্যায় কাজ ও মূর্খতা হতে বিরত হয় না, তার খানাপিনাকে ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বর্ণনায় বুখারী)

ইফতার, দু‘আ ও সেহরী খাওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

১। যখন তোমরা ইফতার কর তখন খেজুর দ্বারা ইফতার করবে। কারণ, উহা বরকতময়। যদি উহা না মিলে তবে পানি পান করবে। কারণ, উহা

হচ্ছে পবিত্র। (বর্ণনায় তিরমিযি)
২।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের সময় বলতেনঃ

ذَهَبَ الظَمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ .أبو داود :٢٣٥٧

"যাহাবাজ্জামাআ ওয়াবতল্লাতিল ওরুক্কু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।। তৃষ্ণা দূরীভুত হয়েছে আর রগরেষাসমূহ পানি দ্বারা পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ চাহেত, ছওয়াবও নির্দিষ্ট হয়েছে। (বর্ণনায় আবু দাউদ)
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

لا يزال الناس بخير ما عجلوا لفطر (متفق عليه)

যখন পর্যন্ত লোকেরা ওয়াক্ত হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
৪। অন্যত্র বলেন

تسحروا فإن فى السحور بركة (متفق عليه)

তোমরা সেহরী খেতে থাক। কারণ, উহাতে বরকত আছে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিয়াম

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "প্রত্যেক মাসে তিন দিন এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করা সমস্ত বছর সিয়ামের সমতূল্য। আরাফার দিন (হাজী ব্যতীত অন্যদের) সিয়ম পালন করলে আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ তার পূর্বের বছরের গুনাহ আর পরের বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আশুরার সিয়াম পালন করলে আল্লহ তার পূর্বের বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (বর্ণনায় মুসলিম)
২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ "যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহাররামের নবম দিনেও সিয়াম পালন করব"। (বর্ণনায় মুসলিম)
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বলেনঃ "ঐ দু'দিন বান্দার আমলসমূহ আল্লাহ্ রাববুল আলামীনের নিকট পেশ করা হয়।

আর আমি এটা পছন্দ করি যে, সিয়ামরত অবস্থায় আমার আমল তাঁর সম্মুখে পেশ করা হবে"। (বর্ণনায় নাসায়ী)

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরে ও ঈদুল আযহার দিনে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৫। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে সমস্ত মাস ব্যাপি সিয়াম সাধনা করেননি। " (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এত অধিক সাওম সাধনা করতেন না। (বর্ণনায় বুখারী)

হজ ও উমরার ফজিলত

১। আল্লহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ ﴾ آل عمران: ٩٧

আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মত সামর্থ যাদের আছে তাদের জন্য জরুরী হল আল্লাহর ঘরের হজ্ আদায় করা। আর যে তাকে (আল্লাহ্ তা'লার হুকুমকে) অস্বীকার করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বিশ্ব জগত হতে মুখাপেক্ষীহীন। (সূরা আল'ইমরান, ৯৭)

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

এক ওমরাহ্ হতে পরবর্তী আর এক ওমরাহ্, এই দুই ওমরাহ পালন করা মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা (মুছে যাওয়া) স্বরূপ আর কবুল হজ্বের বদলা একমাত্র জান্নাত। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

যে ব্যক্তি এমন ভাবে হজ্ব আদায় করল যাতে কোন অশ্লীল কথা বা কাজ বা ফাসেক্বী কোন কর্ম করল না, সে যেন তার পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হল যেন এই মাত্রই তার মা তাকে প্রসব করল। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

خذوا عني منا سككم (رواه المسلم)

তোমরা আমার নিকট হতে হজের নিয়মাবলী শিখে লও। (বর্ণনায় মুসলিম)

৫। হে মুসলিম ভাই! যখনই আপনার নিকট ঐ পরিমাণ অর্থ জমে যা দ্বারা মক্কা শরীফ আসা যাওয়ার ব্যবস্থা হয় তখনই সাথে সাথে ফরজ হজ্ আদায় করুন। আর এটা জরুরী নয় যে, হজের পর অন্যদের জন্য হাদীয়া তোহফা আনার মত খরচ আপনার নাই, তাই কিভাবে হজ করবেন। কারণ, আল্লাহ এই ওযর কবুল করবেন না। তাই অসুস্থ হওয়া, দরিদ্রতা আসা বা পাপী হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্বে হজ করুন। কারণ, হজ হচ্ছে ইসলামের রোকনসমূহের একটি রোকন।

৬। আর ওমরা ও হজের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হবে তাতে ওয়াজিব হচ্ছে উহা হালাল কামাই হতে হবে যাতে করে আল্লাহ তাআলা উহা কবুল করেন।

৭। কোন মহিলার জন্য মাহারেম পুরুষ ব্যতীত একাকী হজ্জের সফর বা যে কোন সফর করা হারাম। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কোন মহিলা কক্ষণই কোন মাহারেম পুরুষ ব্যতীত সফর করবে না"। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৮। কারো সাথে কোন শত্রুতা থাকলে মিটমাট করে নিন। আর ধার দেনা থাকলে তা শোধ করুন। স্ত্রীকে উপদেশ দিন সেজেগুজে বের না হতে। আর গাড়ী হাকানো, ঈদের দিনের মিষ্টি বিতরণ, কোরবাণী ইত্যাদির ব্যাপারেও উপদশ দিন। কারণ আল্লাহপাক বলেন

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ﴾ الأعراف: ٣١

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় কর না। (সূরা আ'রাফ ৩১)

৯। হজ হলো মুসলিমের জন্য বিরাট এক সম্মেলন ক্ষেত্র। এতে তারা একে

অন্যকে জানতে পারে, ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আর একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে তাদের সমস্যাবলী সমধানের জন্য। আর সাথে সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের লাভের কার্যসমূহ করতে পারে।

১০। এর চেয়েও বড় কথা হল, আপনি আপনার নিজের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট কায়মনোবাক্যে সাহায্য চাইতে পারেন। সকলকে ছেড়ে একমাত্র তার নিকটেই দু'আ করতে পারেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴾ الجن: ٢٠

(হে নবী) বলুন, আমিত একমাত্র আমার রবকে ডাকি আর তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (সূরা জিন, ২০)

১১। বছরের যে কোন সময় ওমরাহ করা জায়েয। তবে রমযানে উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

عمرة في رمضان تعدل حجة (متفق عليه)

"রমযানে ওমরা করা হজের সমতুল্য।'' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

১২। আর মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করলে অন্য যে কোন মসজিদে সালাত আদায় করা হতে একলক্ষ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) এক রাক'আত সালাত আদায় করা মসজিদুল-হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার রাক'আত আদায় করা হতে উত্তম। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র তিনি বলেনঃ মসজিদে হারামে সালাত আদায় করা আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা হতে একশত গুণ বেশী উত্তম। (বর্ণনায় আহমদ)

১৩। আপনার জন্য উত্তম হল হজে তামাত্তু করা। উহা হচ্ছে প্রথমে ওমরাহ্ করা, তারপর এহরাম হতে হালাল হয়ে তারপর হজ আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে মুহাম্মদের বংশধর ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ হজ আদায় করে সে যেন হজের সাথে ওমরাহ্ আদায় করে। (বর্ণনায় ইবনে হিব্বান)

ওমরাহ্‌র আমলসমূহ

এহ্‌রাম, তাওয়াফ, সা’য়ী, হলক, তাহাল্লুল।

১। আল এহ্‌রামঃ- মিকাতে প্রবেশের পূর্বে এহ্‌রামের কাপড় পরিধান করুন। আর বলুন “লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা বিওমরাহ” হে আল্লাহ্‌, উপস্থিত ওমরাহ্ করতে।

তারপর উচ্চ স্বরে তলবীয়া “লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা-শারীকালাকা লাব্বায়িক ইন্নাল হামদা ওয়াননেমাতা লাকা ওয়াল মুলক লা-শারীকালাক” অর্থাৎ, উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি। এমন এক সত্বার নিকট উপস্থিত হয়েছি হে আল্লাহ্‌, আপনার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত সমস্তই আপনার নিকট হতে এবং সমস্ত রাজত্বও আপনারই। আর আপনার কোন শরীক নেই।

২। তওয়াফঃ- যখন মক্কাশরীফ পৌঁছবেন, তখনই হারাম শরীফ চলে যান, তারপর কা’বা ঘরের চতুর্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করুন। শুরু করবেন হজরে আসওয়াদ হতে। শুরুতে বলবেনঃ বিসমিল্লাহ্‌, আল্লাহু আকবার। যদি সমর্থ হন তবে পাথরে চুমা খান, তা না হলে ডান হাত দ্বারা ইশারাহ করুন। যদি সমর্থ হন তাহলে প্রতিবারই ডান হাত দ্বারা রোকনে ইয়ামানীতে স্পর্শ করুন। এখানে ইশারাও করা যাবে না, চুমাও খাওয়া যাবে না। আর এই দুই রোকনের মধ্যবর্তী জায়গায় বলুন “রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতান, ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতান, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার” অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও। আর আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন।

তারপর তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু’রাক’আত সালাত আদায় করুন। প্রথম রাক’আতে পড়ুন সূরা কাফিরুন আর দ্বিতীয় রাক’আতে পড়ুন সূরা ইখলাস।

৩। সা’য়ীঃ- তারপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ। করুন। তারপর কা’বার দিকে মুখ করে দু’হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে পড়ুনঃ

﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ ﴿١٥٨﴾ ﴾ البقرة: ١٥٨

“ইন্নাসসাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা’য়ায়িরিল্লাহ।’’

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

সাফা দিয়ে সায়ী শুরু করুন। যেমন আল্লাহ সাফার কথা দিয়ে শুরু করেছেন।
তারপর কোন ইশারা ব্যতীতই তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলুন। তারপর বলুন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল, হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া সাদাক্বা'আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাব ওয়াহদাহ" তিনবার। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই আর সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি একাই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন।
তারপর প্রতিবার সাফা ও মারওয়াতে উঠে একই নিয়ম পালন করুন। আর সাথে সাথে দু'আ করুন। সাফা ও মারওয়ার মাঝের সবুজ বাতির অংশটুকু দ্রুত অতিক্রম করুন। সায়ী করতে হবে সাতবার। যাওয়ায় একবার ও আসায় একবার, মোট দুইবার হিসাব করে সাতবার পূর্ণ করতে হবে।
৪। এটা শেষ হলে পূর্ণভাবে মাথামূন্ডন করুন অথবা চুল খাটো করুন। মহিলারা তাদের চুলের অগ্রভাগ সামান্য কাটবে।
৫। এই ভাবেই আপনি ওমরাহর সমস্ত আমল শেষ করলেন এবং এহরাম অবস্থা হতে হালাল হয়ে স্বাভাবিক হলেন।

হজের আমলসমূহ

এহরাম, মিনাতে রাত্রি যাপন, আরাফাতে অকুফ করা, মুযদালাফাতে রাত্রি যাপন করা, রমী, যবেহ, চুল মুন্ডান, তওয়াফ, সায়ী, হালাল হওয়াঃ-
১। জ্বিলহজ্জের অষ্টম দিবসে মক্কাতে এহরামের কাপড় পরিধান করুন। তারপর বলুন " লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা বিহাজ্জাতি" (হে আল্লাহ, আমি হজের নিয়ত করলাম। তারপর মিনাতে গমন করে সেখনে রাত্রি অতিবাহিত করুন। ঐ স্থানে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত কসর করে আদায় করুন। যোহর, আসর এশা এই তিন সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্তে কসর করে আদায় করুন।
২। তারপর জিলহজের নবম দিবসে সুর্য উদয়ের পরে মিনা হতে আরাফাতে গমন করুন। সেখানে যোহর ও আসরকে "জমা তাকদীম" করে আদায় করুন এক আযান ও দুই একামতে। তখন কোন সুন্নত আদায়

করার প্রয়োজন নেই। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান হবেন। তা হল আরাফাতের সীমার মধ্যে থাকবেন, খাওয়া দাওয়া করবেন, তালবীয়া পাঠ করবেন আর এক আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবেন। কারণ, আরাফাতে অকুফ (অবস্থান) করা হজের রোকনসমূহের মূল। আর মসজিদে নামিরার বেশীরভাগ আরাফাতের বাহিরে। (তাই সালাত শেষে মসজিদ হতে বের হয়ে আবার আরাফাত ময়দানে অকুফ করা উচিত)

৩। সূর্যাস্তের পর আরাফাত হতে বের হয়ে মুযদালাফার দিকে রাওয়ানা হউন। সেখানে মাগরিব ও এশাকে এক করে "জমা তাখির" সালাত আদায় করুন। তারপর সেখানে রাত্রি যপন করে ফজরের সালাত আদায় করুন। তারপর মাশআরুল হারামে বেশী করে আল্লাহকে স্বরণ করুন। তবে দুর্বলরা এখানে রাত্রি যাপন না করলেও তা জায়েয হবে।

৪। তারপর সূর্য উঠার পূর্বেই মুদালাফা হতে রাওয়ানা হয়ে মিনার দিকে অগ্রসর হউন। মিনাতে পৌছেঁ বড় জমরাতে সাতটা ছোট কংকর আল্লাহু আকবার বলে নিক্ষেপ করুন। সূর্য উঠার পর এমনকি রাত্র পর্যন্ত উহা নিক্ষেপ করা চলে।

৫। তারপর যবহ করুন এবং মিনা বা মক্কাতে ঐ গোশ্ত আহার করুন। ঈদের তিন দিন নিজেরাও আহার করুন আর ফকির, মিসকিনদের মধ্যে ও গোশ্ত বিলিয়ে দিন। যদি আপনার নিকট কোরবাণী করার টাকা না থাকে তবে হজের মধ্যে তিন দিন সিয়াম পালন করুন আর বাকী সাতদিন দেশে প্রত্যাবর্তন করে আদায় করুন। মেয়েদের জন্যও একই হুকুম। তার উপরও যবেহ করা ওয়াজিব, অসমর্থ হলে সিয়াম পালন করবেন। এই নিয়ম হজে তামাত্তুর বেলায় প্রযোজ্য। তারপর আপনার মস্তককে পূর্ণভাবে মুন্ডিত করুন বা সমগ্র মাথার চুল খাটো করুন। তবে মুন্ডন করা উত্তম। তারপর আপনার পোষাক পরিধান করুন। এখন আপনার জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সমস্ত কিছুই হালাল হল।

৭। তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করুন। ইহাকে ঈদের শেষ দিন পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা চলে। এরপর আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাস আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

৮। তারপর ঈদের কয়েক দিনের জন্য মিনাতে প্রত্যাবর্তন করুন। ওয়াজিব হিসাবে ওখানে রাত্রি অতিবাহিত করুন। প্রত্যহ যোহরের পর তিনটা জমারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। শুরু করবেন ছোট টা হতে। ইহা রাত্রি

পর্যন্ত করা চলে। প্রতিটিতে ৭ টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। প্রতিবার পাথর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলুন। খেয়াল রাখতে হবে কঙ্করগুলো যেন জমারাতে লাগে। যেগুলো লাগবে না তা পুনর্বার নিক্ষেপ করুন। সুন্নাত হচ্ছে, ছোট ও মাঝারী জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করে হাত উঠিয়ে দু'আ করা। পাথর নিক্ষেপে অসমর্থ হলে মেয়েদের, রোগীদের, ছোটদের ও দুর্বলদের পক্ষ হতে অন্যেরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে। যদি কোন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে দ্বিতীয় বা দৃতীয় দিনেও উহা নিক্ষেপ করা যাবে।

৯। বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। এই তাওয়াফ করার সাথে সাথে সফর শুরু করতে হবে।

হজ ও ওমরাহর আদবসমূহ

১। ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হজ আদায় করুন। মনে মনে বলুনঃ হে আল্লাহ ! এই হজ কোন লোক দেখানো আমল বা নামের নাম নয়।

২। নেককার লোকদের সাথে সফর করুন এবং তাদের খেদমত করতে সচেষ্ট হোন। আর আপনার প্রতিবেশীর দেয়া কষ্ট সহ্য করতে সচেষ্ট হোন।

৩। ধুমপান ত্যাগ ও সিগারেট ক্রয় করা হতে সাবধান হোন। কারণ উহা হারাম। উহা শরীরকে, পার্শ্ববর্তীজনকে ও সম্পদের ক্ষতি করে। আর উহা আল্লাহ পাকের স্পষ্ট নাফরমানী।

৪। প্রতিটি সালাতের সময় মেসওয়াক করতে তৎপর হোন। সেখান থেকে যমযমের পানি ও খেজুর হাদিয়া হিসাবে বহন করুন। কারণ এগুলোর ফজিলত সম্বন্ধে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছ।

৫। মেয়ে মানুষ স্পর্শ করা হতে সাবধান হোন। তাদের প্রতি অহেতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আর আপনার সাথী মেয়েদের সর্বদা পর্দার মধ্যে রাখতে সচেষ্ট হোন।

৬। কখনো মুসল্লিদের কাধ ডিঙ্গিয়ে, তাদের কষ্ট দিয়ে চলাফেরা করবেন না। বরং যেখানে স্থান পান সেখানেই বসতে সচেষ্ট হোন।

৭।দুই মাজিদুল-হারামেও সালাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করবেন না। কারণ উহা শয়তানের কার্য।

৮। সালাত আদায়ে ধীর স্থিরতা প্রদর্শন করুন। কোন সুতরা যেমন দেওয়াল, কারো পিছনে সালাত আদায় করুন। ইমামের সুতরাই পিছনের

ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট।
৯। তাওয়াফ, সায়ী, পাথর নিক্ষেপ, হজরে আসওয়াদে চুমা খাওয়া ইত্যাদি কাজের সময় আপনার আশপাশের লোকদের প্রতি খেয়াল করবেন যাতে তারা কোন কষ্ট না পায়। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ।
১০। গাইরুল্লাহর নিকট দুআ করা হতে সাবধান থাকবেন। কারণ, উহা ঐ শিরকের অন্তর্ভক্ত, যাতে হজ্জ ও তার সমস্ত আমলই বাতিল হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তালা বলেনঃ

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾﴾ الزمر: ٦٥

যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা যুমার ৬৫)

মসজিদে নববীর কিছু আদব কায়দা

১। যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন ডান পা প্রথমে এগিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করুন্ এবং বলুনঃ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللَّهُمَّ افتح لى أبواب رحمتك

“বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা” অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি, তাঁর রাসূলের উপর সালাত ও সালাম । হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দিন।
২। তারপর দুই রাকআত তাহইয়াতুল মসজিদের সালাত আদায় করুন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এই বলে সালাম পেশ করুন- “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু আলাইকা ইয়া ওমার । তারপর কেবলার দিকে মুখ করে দু’আ করুন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যখন কোন কিছু চাও একমাত্র আল্লাহর নিকট চাও, যদি কোন সাহায্য চাও তবে একমাত্র তাঁর নিকটই সাহায্য চাও”। (বর্ণনায় তিরমিযি)
৩। মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত এবং তাঁর উপর সালাম দেয়া মুস্তাহাব। এর সাথে হজ সহীহ হওয়া বা না হওয়ার

কোন সম্পর্ক নেই। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়ও ঠিক করা নেই।
৪। যিয়ারতের সময় রওজা শরীফের জানালা বা দেয়াল স্পর্শ করা বা চুমা খাওয়া হতে নিজকে বাঁচান। কারণ, উহা হচ্ছে বিদআত।
৫। যখন মসজিদ হতে বের হন তখন কবরকে সামনে রেখে এবং কবরের দিকে মুখ করে পিছিয়ে আসা বিদআত। এর পক্ষে কোন দলিল নেই।
৬। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশী বেশী দরুদ পাঠ করুন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করবেন। (বর্ণনায় মুসলিম)
৭। জান্নাতে বাকী কবরস্থান এবং অহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করাও মুস্তাহাব। তবে সাত মসজিদের ব্যাপারে কোন দলিল নেই।
৮। মদীনা শরীফ সফর করার সময় নিয়ত হবে মসজিদে নববীর যিয়ারত। তারপর ওখানে পৌঁছলে পরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম করার নিয়ত করতে হবে। কারণ, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায় করা হতে হাজার গুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন মসজিদ ব্যতিত অন্যত্র কষ্ট করে সাওয়াবের আশায় যিয়ারতে যাবে না। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা, আর আমার এই মসজিদ। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

মুজতাহিদগণের হাদীস অনুযায়ী চলার ঘটনা

চার ইমাম-কে আমাদের তরফ হতে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের প্রত্যেকেই তাদের নিকট যে হাদীসসমূহ পৌছেছিল তার উপর ইজতেহাদ করে ছিলেন। তাদের একে অপরের সাথে যে মত পার্থক্য ঘটেছিল তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, কারো নিকট কোন হাদীস পৌছেঁ ছিল যা কিনা অন্যের নিকট পৌছেঁ নাই। কারণ, সেই যামানায় হাদীসের খুব বেশী প্রসার ঘটেনি। আর হাদীসের হাফেজগণ নানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। কেহ ছিলেন হিজাযে, কেহ শামে, কেহ ইরাকে, কেহ মিসরে বা অন্যান্য মুসলিম দেশে। তাদের যামানায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত ছিল খুবই কঠিন ও কষ্টবহুল। সে কারণে দেখতে পাই, ইমাম

শাফেয়ী (রঃ) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন ইরাকে তার যে পুরাতন মাযহাব ছিল তা ত্যাগ করেন। কারণ, তখন তাঁর সম্মুখে নুতন নুতন বহু সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হয়।

তাই দেখতে পাই ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মাযহাব হচ্ছে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু ছুটে যায় কিন্তু অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফাহ্ (রঃ) এর মতে ছুটে না। এমত অবস্থায় আমাদের উপর ওয়াজিব হল কুরআন ও সহীহ সুন্নাতকে তালাশ করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٩

অর্থাৎ যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তার বিচারের ভার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দাও যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনে থাক। উহাই হচ্ছে উত্তম এবং সঠিক ব্যাখ্যা। (সূরা নিসা ৫৯)

আর আমাদেরকে তো হুকুম করাই হয়েছে আল্লাহ তাআলার নিকট হতে যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। আর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা দান করেছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ ﴾ الأعراف: ٣

তোমাদের রবের তরফ হতে যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ কর। তাকে ছেড়ে অন্য কোন আউলিয়াদের অনুসরণ কর না। তোমরা খুব কমই ইহা স্মরণ কর। (সূরা আ'রাফ ৩)

তাই কোন মুসলিমের সামনে কোন সহীহ হাদীস পেশ করলে তাকে এই বলে ত্যাগ করা জায়েয নেই যে, উহা আমাদের মাযহাব বিরোধী। কারণ সমস্ত ইমামগণের এজমা হচ্ছে সর্বদা সহীহ হাদীস গ্রহণ করা, আর উহাদের খেলাফ তাদের যে মতবাদ তা পরিহার করা।

হাদীস সম্বন্ধে ইমামগণের মতামত

নিম্নে ইমামগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। তাদের উল্লেখিত বক্তব্যের মাধ্যমে, তাদের উপর যেসব দোষারোপ করা হয়, তা দূরীভুত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট সত্য উদঘাটিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) -প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর ফেকহার নিকট ঋনী- বলেনঃ

১। কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জ্ঞাত হবে ইহা আমরা কোথা হতে গ্রহণ করেছি।

২। ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম, যে আমার দলীল না জেনে, শুধু কথার উপর ফতোয়া দেয়। কারণ আমরা মানুষ। আজ এক কথা বলি আগামীকাল আবার উহা হতে প্রত্যাবর্তন করি।

৩। যদি আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলের কথার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তখন আমার কথাকে ত্যাগ করবে।

৪। ইমাম ইবনে আবেদীন তার কিতাবে বলেনঃ যদি কোন হাদীস সহীহ হয় আর উহা মাযহাবের বিরোধী হয় তথাপি ঐ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। উহাই হবে তার জন্য মাযহাব। কোন মোকাল্লেদ উহার উপর আমলের দ্বারা হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে যাবেন না। কারণ সহীহ রেওয়াতে ইমাম ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ যদি হাদীস সহিহ হয় তবে উহাই আমার মযহাব।

ইমাম মালেক (রঃ) যিনি মদীনা মনোয়ারার ইমাম বলে খ্যাত ছিলেন, তিনি বলেনঃ

১। আমিতো একজন মানুষ মাত্র। ভুলও করি, শুদ্ধও করি। তাই আমার রায়কে উত্তমভাবে পর্যবেক্ষণ কর। তার মধ্যে যেগুলো কোরআন-হাদীসের সাথে মিলে তাদের গ্রহণ কর। আর যেগুলো কোরআন ও হাদীসের সাথে মিলে না তাকে ত্যাগ কর।

২। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কিছু কথা গ্রহণ করাও চলে, আর কিছু ত্যাগ করাও চলে। শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথা গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) যিনি আহলে বাইতের (নবীর বংশধর) একজন, তিনি বলেনঃ

১- এমন কেহ নেই যার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু সুন্নাত আছে আর কিছু গায়েব আছে। তাই আমি যত কথাই বলি না

কেন, আর যত উসূলী কথাই বলি না কেন, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তার বিপরীত কোন কথা আমার দ্বারা বলা হয়ে থাকে তবে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই গ্রহণযোগ্য, আর উহাই আমার মত বলে ধরা হবে।

২-মুসলমানদের ইজমা হয়েছে যে যদি কারও নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সুন্নাত প্রকাশিত হয় তাঁর কথাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয হবে না।

৩-যদি আমার কোন কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কথা দেখতে পাও তবে তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকেই গ্রহণ করবে। উহাই আমার কথা

৪- যদি কোন হাদীস সহীহ হয় তবে উহাই আমার মাযহাব।

৫- একদা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলকে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা আমার থেকে হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। যদি কোন সহীহ হাদীস পাও তবে সাথে সাথে আমাকে জ্ঞাত করবে যাতে আমি তার উপর মাযহাব বানাতে পারি।

৬। ঐ সমস্ত মাসআলা যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমি যা বলেছি তা সহীহ হাদীসের বিপরীত তবে আমি আমার জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরও উহা হতে বিরত হচ্ছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) যাকে ইমামু আহলে সুন্নাত বলা হয়, তিনি বলেনঃ

১। আমাকে তাকলীদ (অন্ধঅনুসরণ) কর না, আর না মালেক বা শাফেয়ী (রঃ) বা আওযায়ী (রঃ) অথবা সাওরী (রঃ) কে অনুসরণ কর। বরং তারা যেখান হতে গ্রহণ করেছে সেখান হতে গ্রহণ কর। (যারা বুঝেছে ও শিখেছে তাদের হতে)

২। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীসকে অস্বীকার করবে সেতো ধংসের মুখামুখি এসে দাড়িয়েছে।

ক্বদরের ভাল ও মন্দের উপর ঈমান আনা

ইহা হচ্ছে ঈমানের ভিত্তিসমূহের ষষ্ঠ ভিত্তি। এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. তার আরবাইন হাদীসের ব্যখ্যা গ্রন্থে বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের ভাগ্য অতীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর ঐ সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা কখন, কিভাবে অবগত

আছেন। কোন স্থানে ঘটবে তাও তিনি অবগত আছেন। আর অবশ্যই উহা ঘটবে ঐ ভাবেই যেভাবে তাঁর নিকট উহা লিপিবদ্ধ আছে।

ক্বদর বা ভাগ্যর উপর কয়েক ধরনের ঈমান আনতে হবে-

১। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্বদর (নির্দিষ্টকরণ) উহা হচ্ছে ঐ ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহপাক পূর্ব হতেই জ্ঞাত আছেন বান্দারা ভাল ও মন্দ কায, কিভাবে করবে। তাদের সৃষ্টি ও দুনিয়াতে পয়দা করার পূর্বেই তিনি জ্ঞাত আছেন তারা কি তার আনুগত্য করবে নাকি বিরোধিতা করবে। আর তাদের মধ্যে কারা জান্নাতী হবেন আর কারা জাহান্নামী হবে। আর তাদের সৃষ্টি ও গঠনের পূর্বেই তিনি তাদের জন্য উত্তম বদলা বা শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাদের ভাল বা মন্দ আমলের জন্য। আর প্রতিটি জিনিসই উত্তমভাবে লিপিদ্ধ করে তাঁর নিকটে রেখেছেন। আর বান্দার প্রতিটি কাযই ঐ ভাবে ঘটেতে থাকে যেভাবে উহা তাঁর এলেমের মধ্যে ও কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

(এই অংশটুকু রজব হাম্বলী (রঃ) এর জামেয়ুল উলুম ওয়াল হেকাম কিতাবহতে নেয়া হযেছে)

২। লওহে মাহফুযে যে তকদীর লিপিবদ্ধ আছেঃ ইবনে কাসির (রঃ) তাঁর তফসীরে, আব্দুর রহমান ইবনে সালমানঃ আল্লাহপাক যা কিছুই নির্দিষ্ট করেছেন, কোরআনপাক বা তার পূর্বের বা পরের ঘটনা সমস্ত কিছুই লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করেছেন অর্থাৎ উহা “মালাউল আ’লাতে” আছে। (তফসীরে ইবনে ইবনে কাসীর চতুর্থ পৃঃ ৪৯৭)

৩। মায়ের গর্ভে ভাগ্য লিখাঃ হাদীসে বর্ণিত আছে (....তারপর মায়ের গর্ভের এই নবজাতকের নিকট আল্লাহপাক এক ফেরেশতা (মালাইকা) পাঠান, যিনি তার মধ্যে আত্মা ফুকিয়ে দেন এবং তাকে চারটা কথা লিখতে বলেন. যথাঃ তার রিযিক, আয়ু, আমল দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৪। সময় নির্দিষ্ট করার তকদীরঃ উহা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ। আল্লাহপাক ভাল ও মন্দকে সৃষ্টি করেছেন। আর উহা কখন কিভাবে বান্দার নিকট উপস্থিত হবে তারও নির্দিষ্ট সময় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। (শরহে আরবাইন)

তাকদীরের উপর ঈমান আনার লাভসমূহ

১। আল্লাহর উপর রাজী খুশী থাকা, ইয়াকিন, আর উত্তম প্রতিদান অর্জন

করা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ ﴿١١﴾ ﴾ التغابن: ١١

যে সমস্ত বিপদ আপদই (তোমাদের) স্পর্শ করুক না কেন উহা আল্লাহর অনুমতি নিয়েই আসে। (সুরা আত্তাগাবুন, ১১)

এর ব্যাখ্যায় উবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমেই ঘটে অর্থাৎ তাঁর দেয়া তক্বদীর ও বিচারের মাধ্যমেই এটা ঘটে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ

আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে আল্লাহ তার অন্তরে হেদায়েত দিয়ে দিবেন। (সূরা তাগাবুণ ১১)

ইবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তফসীরে বলেনঃ আর যাকে কোন মুসিবতে পাকড়াও করে তার অবশ্যই বুঝা উচিত যে, এটা আল্লাহর বিচারে হয়েছে এবং উহা তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ফলে সে ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াবের আশায়। আর তারপর যখন আল্লহর বিচারকে মেনে নেয় তখন আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে হেদায়াত, সত্যিকারের একিন দান করেন। আর তার নিকট হতে যা ছিনিয়ে নেয়া হয় তা অথবা তার থেকে উত্তম জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তার অন্তরে এমন হেদায়েত দেন যাতে একিন এসে যায়। তখন সে বুঝতে পারে, তাকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে তা ভুলক্রমে নয়। আর সে যে ভূল করেছে তা শুদ্ধ করার ক্ষমতা তার ছিল না।

আল কামাহ (রঃ) বলেনঃ সেই ব্যক্তিকে যখন কোন মুসিবত স্পর্শ করে তখন সে বুঝতে পারে, উহা আল্লাহর নিকট হতেই এসেছে।

২। গুণাহ্ মাফ হওয়াঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ما يصيب المؤمن من وصب ، ولا نصب ، ولا سقم ، ولا حزن ، حتى الهم يهمه ، إلا كفر به من سيئاته

কোন মুমিন বান্দা যত রকমের মুসিবত, কষ্ট, অসুস্থতা, পেরেশানী, এমনকি যে দুঃশ্চিন্তায় পতিত হয় তার দ্বারা আল্লাহ তার পাপসমূহ দুরীভূত করেন। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩। উত্তম বদলা দানঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧ ﴾ البقرة: ١٥٧

আর ঐ সমস্ত সবরকারীদের সুসংবাদ দান করুন যখন তাদের কোন মুসিবত স্পর্শ করে তখন তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ হতে আর নিশ্চয়ই তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। তাদের উপর তাদের রবের নিকট হতে মাগফিরাত ও রহমত বর্ষিত হবে। আর তারাই হচ্ছে হেদায়েত প্রাপ্ত। (সূরা আল বাক্বারা ১৫৫-১৫৭)

৪। অন্তর ধনী হওয়াঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন যদি তাতে খুশী থাক তবে তুমি সবার চেয়ে ধনী হয়ে যাবে। (বর্ণনায় আহমদ তিরমিযি)
অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (শুধুমাত্র সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই সে ধনী হয় না, বরং ধনী সেই ব্যক্তি যার অন্তর ধনী। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
এটা লক্ষ্য করা যায় যে, যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী তারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। ফলে তারা অন্তরের দিক দিয়ে দরিদ্র। আর যে ব্যক্তি সামান্য বিত্ত সম্পদের মালিক, কিন্তু তার যথাসাধ্য চেষ্টার পর, আল্লাহ তার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন সে খুশী থাকে তখনই তিনি অন্তর ধনী হয়ে উঠেন।
৫। অতিরিক্ত খুশী ও হয় না, আর দুঃখিতও হয় নাঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣ ﴾ الحديد: ٢٢ - ٢٣

অর্থাৎ যে কোন মুছিবতই যা দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয় বা তোমাদের স্পর্শ

করে তা পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ আছে তাদের সৃষ্টির পূর্বেই। আর উহা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আর এটা এজন্য বলা হলো যাতে তোমাদের যা নাগালে আসে না তাতে দুঃখিত না হও, আর যা প্রাপ্তি ঘটে তাতে অতিরিক্ত খুশী না হও । কারণ আল্লাহ কোন অহংকারী লোককে পছন্দ করেন না। (সূরা আল হাদীদ ২২-২৩)

ইবনে কাছির রহ. বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের যে নিয়ামত দিয়েছেন তার জন্য লোকদের সম্মুখে নিজের অহংকার প্রকাশ করবে না। কারণ, উহা তোমাদের প্রচেষ্টার কারণে নয়। বরং উহা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং তিনিই রিযিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহকে তোমাদের অহংকার প্রকাশের রাস্তা বানাবে না। একরামাহ (রঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তিরই অতিরিক্ত খুশী বা দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। বরং, যখন খুশীর কোন ঘটনা ঘটে তখন শুকরিয়া আদায় করবে, আর যখন দুঃখের কোন ঘটনা ঘটবে তখন সবর করবে। (তফসীরে ইবনে কাছির, চতুর্থ খন্ড)

৬। নির্ভীকতা ও সাহসিকতাঃ যে ব্যক্তি কৃদরের উপর বিশ্বাস করেন তিনি অবশ্যই সাহসী হবেন। আর আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় পাবেন না। কারণ তিনি জানেন, মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আর তিনি যা ভুল করবেন তা কখনো শুদ্ধ হওয়ার ছিল না। আর তাকে যে বিপদ স্পর্শ করে তা ভুল করে নয়। আর সবরকারীদের জন্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে। আর দুঃখ কষ্টের পর প্রশান্তি আসবে। আর বিপদের পরই সুখ।

৭। মানুষ কর্তৃক ক্ষতি হওয়া হতে নির্ভীক হওয়াঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

অর্থাৎ জেনে রাখ, যদি সমস্ত মানুষ মিলেও তোমার কোন ভাল করতে চায় তবে তা কখনো সম্ভবপর হবে না, যদি না আল্লাহ তা তোমার ভাগ্যে লিখে রাখেন। আবার তারা যদি সকলে মিলেও তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় আর আল্লাহ যদি ঐ ক্ষতি করার কথা না লিখে রাখেন তবে কেহই কোন

ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠাও শুকিয়ে গেছে। (বর্ণনায় তিরমিযি।)

৮।মৃত্যু হতে নির্ভীক হওয়াঃ

আলী (রাঃ) এক কবিতার মাধ্যমে বলেনঃ

আমি কোন দিন মৃত্যুর হাত হতে পলায়ন করব, যেদিন আমার ভাগ্যে মওত লেখা আছে সেদিন, না যেদিন লেখা নেই, সে দিন? সে দিনতো ভয়ই পাবনা। আর যেদিন লেখা আছে, ঐদিন তো বাঁচার কোন রাস্তা নেই।

৯। যা কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তাতে অনর্থক অনুশোচনা না আসাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن بالله . ولا تعجز . وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله . وما شاء فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان

শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হতে আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম ও অধিক ভালবাসার পাত্র। তবে তাদের উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তাই সর্বদা ঐ কাজে সচেষ্ট হও যা তোমার উপকারে আসবে। আর সর্বদা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, কখনও নিজেকে অক্ষম ভাববে না। যদি তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তবে এই বলবেন না যে, যদি আমি এভাবে বা ওভাবে করতাম তবে তার ফল এ রকম হত। বরং বলবে, আল্লাহ তাআলা যা তক্বদীরেরেখেছিলেন ও ইচ্ছা করেছিলেন তাই ঘটেছে। কারণ, "যদি" কথাটি শয়তানের রাস্তা খুলে দেয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

১০। আর আল্লাহ তাআলা যা নির্দিষ্ট করেছেন তার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছেঃ ধরুণ, কোন মুসলিমের হাত কিছুটা কেটেছে। সে এই বলে আল্লাহর প্রশংসা করবে যে, হাতটা ভাঙ্গেনি। আর যদি ভাঙ্গে তবে এই বলে শোকরিয়া আদায় করবে যে, উহা কাটা পড়েনি। অথবা তার পিঠ যে ভাঙ্গেনি তাতে শুকরিয়া আদায় করবে। কারণ তা আরও ভয়ঙ্কর।

একটি ঘটনাঃ এক ব্যবসায়ী একদা কোন ব্যবসায়িক কারণে বিমানে আরোহণের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। এমনি সময় মুয়াযযিন

আযান দেন সালাতের জন্য। ফলে তিনি জামাতে সালাত আদায় করতে চলে যান। যখন সালাত শেষ হল তখন জানতে পারলেন যে, বিমান চলে গেছে। ফলে খুব পেরেশান হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর খবর আসলো যে, প্লেনটি আকাশে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষনাৎ তিনি সিজদায় পড়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন নিজে বেঁচে যাওয়ার কারণে ও সালাতের কারণে দেরী হওয়াতে। তাই আল্লাহর ঐ কথা স্মরণ করুনঃ

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦ ﴾ البقرة: ٢١٦

আর তোমরা হয়ত কোন জিনিসকে অপছন্দ কর কিন্তু উহা তোমাদের জন্য উত্তম। আর হয়ত কোন জিনিসকে পছন্দ কর যা কিনা তোমাদের ক্ষতিকর। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞাত আর তোমরা কিছুই জ্ঞাত নও। (সূরা বাকারাহ, ২১৬)

কদর নিয়ে তর্ক করতে নেই

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব হল, সে এই আক্বীদা পোষণ করবে যে, ভাল ও মন্দ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। আর উহা তাঁর এলেমে ও ইচ্ছাতে আছে। কিন্তু ভাল ও মন্দ করার সামর্থ বান্দার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। আর তার উপর ওয়াজিব হল আদেশ ও নিষেধ পালনে তৎপর হওয়া। তার জন্য এটা জায়েয হবে না কোন পাপ কর্ম করে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ আমার জন্য এই পাপকে নির্দিষ্ট করেছিলেন তাই করেছি। নাইযুবিল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের উপর কিতবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুখের রাস্তা ও দুঃখ কষ্টের রাস্তা। আর মানুষকে সম্মানীত করেছেন বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দ্বারা। আর সাথে সাথে তাকে গোমরাহী ও হেদায়েতের রাস্তা শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا ٣ ﴾ الإنسان: ٣

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছি। এরপর হয় সে শুকুর গুজার বান্দা হবে, না হয় কুফরির রাস্তা এখতিয়ার করবে। (সূরা আল ইনসান ৩)

মানুষ যদি সালাত ত্যাগ করে বা মদ্যপান করে তবে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে আল্লাহর হুকুম ও নিষেধ অমান্যের কারণে। তখন তার উপর কর্তব্য হল তওবা করা এবং অনুতপ্ত হওয়া। তখন কদরে লেখা আছে বলে রেহাই পেতে পারে না।

ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ

নিশ্চয় ঈমান ভঙ্গকারী কারণ রয়েছে, যেমন অজু ভঙ্গের কারণসমূহ আছে। যদি কোন ওযুকারী ওযু ভঙ্গের কোন একটা আমলও করেন তবে তার ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন তার উপরে ওয়াজিব হল তিনি উহাকে নতুন করে করবেন, সেই রকম ঈমানের ক্ষেত্রেও।

ঈমান নষ্টকারী কারণসমূহ চার ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম ভাগঃ এতে সামিল আছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা তাতে কোন সন্দেহ করা।

দ্বিতীয় ভাগঃ আল্লাহ তাআলা যে সত্যিকার মা'বুদ তা অস্বীকার করা অথবা তাঁর সাথে কোন শিরিক করা।

তৃতীয় ভাগঃ আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ অস্বীকার করা অথবা তাঁর সিফাতসমূহ অস্বীকার করা অথবা তাতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা।

চতুর্থ ভাগঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করা অথবা তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।

প্রথম ভাগ

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা

এর কয়েকটা ক্ষুদ্র প্রকারভেদ রয়েছে।

১। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। যেমন নাস্তিকরা করে থাকে এই বলে যে, স্রষ্টা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। আর তারা বলেঃ কোন উপাস্য নেই। বরং জীবন হচ্ছে পদার্থ হতে। তারা প্রমাণ দেখায় যে, সৃষ্টি হওয়া এই সমস্ত কাজকর্ম হঠাৎ হয়ে যায় এবং প্রাকৃতিক কারণেই এগুলো ঘটে থাকে। তারা প্রকৃতি ও হঠাৎ হওয়ার যিনি মালিক তার কথা ভুলে গেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, আর তিনি এই সমস্ত জিনিসের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক।

(সূরা যুমার, ৬২)
এই দল ইসলামের পূর্বের যামানার কাফিরদের হতেও কট্টর কাফির। এমনকি শয়তান হতেও । কারণ, তারা উভয়েই তাদের স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেনঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴿٨٧﴾ ﴾ الزخرف: ٨٧

যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। (সূরা যুখরুফ ৮৭)
শয়তান সম্পর্কে আল-কোরআনে বলা হয়েছেঃ

﴿ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ ﴾ ص: ٧٦

সে বলল, আমি তাঁর (আদম) চেয়ে উত্তম, আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেনর আর তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ছোয়াদ ৭৬)
তাই এ জাতীয় কুফরির মধ্যে পড়বে যদি কোন মুসলিম বলে যে , ইহাকে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে অথবা বলে ইহার অস্তিত্ব নিজ থেকেই হয়েছে, যেমনভাবে নাস্তিক বা অন্যরা বলে থাকে।
২। যদি কেহ নিজকে ফের'আউনের মত দাবী করে। যেমন সে বলেছিলঃ

﴿ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ ﴾ النازعات: ٢٤

অর্থাৎ আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভূ। (সূরা নাযিয়াত ২৪)
৩। এই দাবী করা যে, দুনিয়াতে অলীদের মধ্যে কিছু কুতুব আছেন যারা দুনিয়ার কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন, যদিও তারা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তারা এই আক্বীদার ক্ষেত্রে ইসলামের পূর্বের কাফিরদের হতেও অধম। কারণ, তারা (কাফিররা) সর্বদাই স্বীকার করত যে, দুনিয়ার সমস্ত কর্ম পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ ﴾ يونس: ٣١

অর্থাৎ হে নবী ! তাদের প্রশ্ন করুন, কে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করেন

দুনিয়া ও আসমান হতে? আর কে শ্রবণের ও দর্শনের ক্ষমতার মালিক? আর কে জীবিতকে মৃত হতে বের করেন? আর মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করেন? আর কে সমস্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা সাথে সাথে উত্তর দেবেঃ আল্লাহ। হে নবী! আপনি তাদের বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না। (সূরা ইউনুস ৩১)

৪। কিছু কিছু সুফী পীরেরা বলেঃ আল্লাহ তাআলা কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে আছেন। যেমন, ইবনে আরাবী বলে এক সুফী, যাকে দামেস্কে কবর দেয়া হয়েছে, সে বলতঃ

রবও বান্দা, আর বান্দাও রব।

হায় আমার বুঝে আসে না! কে কাকে ইবাদত করবে?

চরমপন্থী সুফীরা আরো বলেঃ

কুকুর আর শুকর তারাতো আমাদের মাবুদ ছাড়া কেউ না, আর আল্লাহ্ তো গীর্জাতে উপাসনা রত যাজক ব্যতীত কেহ নহে।

হাল্লাজ বলতঃ আমিই সে (আল্লাহ) আর তিনিই আমি। ওলামারা তাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা দিয়ে তার কতলের রায় দিয়েছিলেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। তারা যে এই ধরণের সাংঘাতিক কথাসমূহ বলে আল্লাহ তা হতে সম্পুর্ণ পাক ও পবিত্র।

ইবাদতে শিরকের মাধ্যমে ঈমান নষ্ট

দ্বিতীয় ভাগঃ এতে আছে আল্লাহ তাআলা যে মাবুদ তাকে অস্বীকার করা বা তাঁর ইবাদতে কোন শিরক করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলোঃ

তারা, যারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছগাছালি, শয়তান ও অন্যান্য মাখলুকের ইবাদতকারী। আর তারা, যে আল্লাহ্ এই সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা, তাঁর ইবাদত হতে বিরত থাকে। আর এই সমস্ত জিনিস না কারো ভাল করতে পারে আর না পারে ক্ষতি করতে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾ فصلت: ٣٧

আর তার নিদর্শনের মধ্যে আছে রাত্র, দিবস, সূর্য, চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও নয়, বরং ঐ আল্লাহর সিজদা কর যিনি এদের

সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে তারই ইবাদত করতে চাও। (সূরা ফুসিসলাত ৩৭)

২। ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার ইবাদত করার সাথে সাথে অন্য মাখলুকের ও ইবাদত করে থাকে -যেমন আউলিয়াদের ইবাদত করে তাদের ছবি বা কবরকে সামনে রেখে- তারা ইসলামের পূর্বের মুশরিকদের সমতুল্য। কারণ তারাও আল্লাহর ইবাদত করত এবং যখনই প্রচন্ড বিপদে পড়ত একমাত্র তাকেঁই ডাকত। আর সুখের সময় অথবা বিপদ কেটে গেলে অন্যদের ডাকত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আল-কোরআনে বলেনঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ العنكبوت: ٦٥

আর যখন তারা কোন নৌকায় আরোহণ করত তখন ইখলাসের সাথে তাঁকে ডাকত। আর যখন তিনি তাদের রক্ষা করে তীরে পৌছিয়ে দিতেন, তখনই তারা তাঁর সাথে শিরক করত। (সূরা আনকাবুত ৬৫)

আল্লাহ তাআলা এদেরকে মুশরিক বলে বর্ণনা করেছেন যদিও তারা যখন নৌকাতে ডুবে যাওয়ার ভয় পেত তখন এক আল্লাহকে মনে প্রাণে ডাকত। কিন্তু তারা এ নীতির উপর সর্বদা চলত না। বরং যখন তিনি তাদের উদ্ধার করতেন তখন তারা অন্যকেও তাঁর সাথে ডাকত।

৩। আল্লাহ তাআলা ইসলামের পূর্বের আরবদের অবস্থা সম্পর্কে রাজী খুশী ছিলেন না, আর বিপদের সময়ে তাঁকে যে তারা ডাকত ঐ ইখলাসকেও গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। ফলে তাদেরকে তিনি মুশরিক বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাহলে বর্তমান যামানার কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী লোক আজকাল সুখেরও দুঃখের উভয় সময় আউলিয়া বলে কথিত লোকদের কবরে আশ্রয় ও বিপদমুক্তি চায় তাদের সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা? আর তাদের এমন সব জিনিস চায় যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দেবার ক্ষমতা নেই। যেমন রোগ মুক্তি, রিযিক চাওয়া, হেদায়াত চাওয়া ও এই জাতীয় অন্যান্য জিনিস। আর তারা এই সমস্ত অলী-আল্লাহদের যিনি স্রষ্টা, তাকে তারা ভুলে থাকে। যিনি হচ্ছেন রোগে সুস্থতা দানকারী, রিযিকদাতা, হেদায়াত দানকারী। ঐ সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই।

তার অন্যদের কান্নাকাটি শুনতেই পায় না। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۝١٣ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝١٤ ﴾ فاطر: ١٣ - ١٤

আর তোমরা তাকে ছেড়ে অন্যদের যে ডাকছ তারাতো সামান্যতম জিনিসেরও অধিকারী নয়। যদি তাদের কাছে দুআ করো তারাতো তোমার দু'আ শুনতেই পায় না। আর যদি শুনত, কক্ষণই তোমাদের উত্তর দিত না। আর তোমরা যে শিরক করছ তাকে কিয়ামতের দিন তারা পুরাপুরি অস্বীকার করে বসবে। আর আমার মত এইরকম খবরদার ছাড়া অন্য কেহ তোমাকে এইরকম সাবধানও করবে না। (সুরা ফাতির ১৩-১৪)

২। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের যে ডাকা হয় তা তারা শুনতেও পায় না। আর এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাদের নিকট দু'আ করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

হয়ত কেহ বলবেনঃ আমরা তো এই ধারণা পোষণ করি না যে, এই সমস্ত আউলিয়া ও নেককারগণ কোন ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। বরং তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বা শাফায়াতকারী হিসাবে গ্রহণ করছি যাদের অসিলায় আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করি। তাদের উত্তরে আমরা বলবঃ ইসলামের পূর্বের মুশরিকরাও এই ধারনাই পোষণ করতো। তাদের সম্বন্ধে আল-কোরআন বলেছেঃ

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝١٨ ﴾ يونس: ١٨

আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের যে ইবাদত করত তাদের না কোন ক্ষতি করতে পারত, আর না ভাল করতে পারত। তারা বলত, এরা হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াতকারী। হে নবী আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কোন কথা বলতে চাও যা আসমান ও জমিনের কেহ জানে না? সমস্ত পবিত্রতাতো আল্লাহর।

আর এরা যে শিরক করেছে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। (সূরা ইউনুস ১৮)
এই আয়াত হতে এটা স্পষ্টই প্রতিয়মান হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে ও দু'আ করে তারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। যদি ও তাদের অন্তরে এটা থাকে যে, তারা ভাল বা মন্দ কিছুই করতে পারে না, বরং তারা শুধুমাত্র শাফায়াত করার অধিকারী।
আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾﴾ الزمر: ٣

আর যারা তাকে ছেড়ে অন্যদের আউলিয়া হিসাবে গ্রহণ করে, তারা বলে যে, আমরাতো তাদের ইবাদত করি এজন্য যে, তারা আমাদের আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করায়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা, তারা যে সমস্ত ব্যাপারে মতাবিরোধ করছে তার বিচার অবশ্যই করবেন। আল্লাহ তাআলা কখনো কোন মিথ্যাবাদী কাফিরদের হেদায়েত দান করবেন না। (সূরা যুমার ৩)
এই আয়াতে স্পষ্টভাবে এটাই বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের জন্য গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করবে তারা কাফির। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (নিশ্চয়ই দু'আ হচ্ছে ইবাদত)। (বর্ণনায় তিরমিযি)
৪। ঈমান ভঙ্গকারী আমলের মধ্যে আছে, যদি এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা বিচার করা বর্তমান যামানায় সম্ভব নয়। অথবা অন্যান্য যে মানুষের বানানো নিয়ম কানুন আছে তাকে যদি সহীহ মনে করা হয় তাহলেও সে কাফির। কারণ এই হুকুম দেওয়াটা হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾﴾ يوسف: ٤٠

হুকুম দেওয়ার মালিক ত একমাত্র আল্লাহ। তিনি হুকুম করেছেন তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করবে না। এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু বেশীর

ভাগ লোকেরাই এটা জানে না। (সূরা ইউসূফ ৪০)
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ المائدة: ٤٤

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাজিলকৃত আয়াত দ্বারা বিচার করবে না তারাই হচ্ছে কাফির। (সূরা মায়েদা ৪৪)
আর যদি কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত কানূন ছাড়া অন্য আইন দ্বারা বিচার করে এই ধারণা করে যে, আল্লাহ প্রদত্ত আইনই সঠিক, কিন্তু মানুষের আইনে বিচার করে নিজের নফসানিয়াত অনুযায়ী অথবা কারো অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য, তবে সে জালিম ও ফাসিক। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কাওল অনুযায়ী সে কাফির নয়। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কোন হুকুমকে অস্বীকার করে সে কাফির। আর যে উহাকে স্বীকার করে অথচ সেই অনুযায়ী বিচার করে না সে জালিম ও ফাসিক। ইহাকে ইবনে জরীর তবারী (রঃ) গ্রহণ করেছেন। আর আতা (রঃ) বলেনঃ (কুফর এর ছোট কুফরিও আছে)।
কিন্তু যদি কেহ আল্লাহর শরীয়তকে বাতিল করে ঐ স্থানে মানুষের বানানো কোন আইন কানুনের প্রচলন করে এই বিশ্বাসে যে, উহা এই যামানার জন্য উৎকৃষ্ট, তাবে সে কাফির হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এতে কোন দ্বিমত নেই।
৫। ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছেঃ আল্লাহ প্রদত্ত বিচারে খুশী না থাকা অথবা এতটুকুও ধারনা করা যে, ঐ বিচার বড়ই সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾ النساء: ٦٥

না, কখনো নয়, তোমর রবের কসম ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয় তাতে তোমাকে বিচারক না করে। তারপর তুমি যে বিচার করবে তাতে তাদের অন্তরে কোন কষ্ট অনুভব করবে না বরং তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নেবে। (সূরা নিসা ৬৫)
অথবা আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিচারকে অপছন্দ করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴿٨﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ

﴿ ٩ ﴾ محمد: ٨ - ٩

আর যারা কুফরি করে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তাদের আমলসমূহ গোমরাহীতে পরিণত হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করেছে। ফলে তাদের আমলসমূহকে তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ৮-৯)

ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে
আল্লাহর সিফাতসমূহে শিরক করা

তৃতীয় ভাগঃ এতে আছে আল্লাহ তাআলার সিফাত সমূহকে বা সুন্দর নামসমূহ অস্বীকার করা বা তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করা।

১। ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছে, কোন মুমিন কর্তৃক আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম বা সিফাত সমূহকে অস্বীকার করা যা কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বরা প্রমাণিত। যেমন- আল্লাহ তাআলা যে সর্বজ্ঞাত তা অস্বীকার করা, অথবা তার কুদরতকে বা তার জীবনকে বা শোনা বা দেখাকে বা তার রহমতকে অথবা তিনি যে আরশের উপর আছেন তাকে অথবা তিনি যে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন তাকে অথবা তার হাতকে অথবা চক্ষুদ্বয়কে অথবা অন্যান্য যে সিফাতসমূহ সাবেত আছে তা কোনটি অস্বীকার করা। আবার তা স্বীকার করতে যেয়ে তার কোন বিষয়কে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ الشورى: ١١

তার মত কিছু নেই, কিন্তু তিনি শুনেন ও দেখেন। (সূরা শোরা ১১)

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে এই আয়াতে বলেছেন যে, তার সাথে কোন সৃষ্টির কোন মিল নেই। কিন্তু তার যে শোনার ও দেখার ক্ষমতা আছে তা তিনি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সিফাত ও একই রকম।

২। বিশেষ করে কিছু কিছু সিফাতকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলাও বিশেষ ভুল ও গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত। উহাদের প্রকাশ্য অর্থ হতে অন্য অর্থে নিয়ে যাওয়াও এর মধ্যে শামিল। যেমন এসতোয়াকে এসতাওলা বলা। এসতোয়া অর্থ হল উর্দ্ধারোহণ এবং উচু হওয়া যা ইমাম বুখারী (রঃ) তার সহীহ কিতাবে বলেছেন। ইমাম মুজাহিদ ও আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেন -তারা উভয়ে ছিলেন সালাফে সালেহীনদের

অন্তর্ভুক্ত, কারণ তারা ছিলেন তাবেয়ীন- যখন কোন সিফাতকে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা অস্বীকারের পর্যায়ে পড়ে। কারণ এসতোয়াকে যখন এসতাওলা বলা হয় তখন আল্লাহ তাআলার এক সিফাতকে অস্বীকার করা হয়। উহা হল, আল্লাহ যে আরশের উপর আছেন সেই সিফাতকে অস্বীকার করা, যার কথা কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ طه: ٥

(আল্লাহ তাআলা) রহমান আরশে অবস্থান নিলেন। (উঠলেন ও উর্দ্ধারোহণ করলেন)। (সূরা ত্বাহা ৫)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝١٦ ﴾ الملك: ١٦

তোমরা কি ঐ সত্বা হতে নির্ভয় হয়ে গেলে যিনি আসমানের উপর আছেন আর যিনি তোমাদের পৃথিবীতে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন। (সূরা মুলুক ১৬)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা এক কিতাব লিখেছেন... উহা তার নিকট আছে আরশের উপর। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যখন কোন সিফাতের ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, উহা সাথে সাথে বিকৃত ব্যাখ্যায় পরিণত হয়।

শাইখ মুহাম্মদ আমিন আশ্মানকিতি "আদ্ওয়াউল বয়ান" নামক তফসীরের লেখক তার "মানহাজ ওয়া দেরাসাত ফিল আসমা ওয়াস্সিফাত" নামক গ্রন্থে ২৩ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ আমি এই প্রবন্ধকে শেষ করতে চাচ্ছি ২টি বিষয়ে আলোচনা করেঃ

প্রথমতঃ যারা এভাবে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে তাদের খেয়াল করা উচিত আল্লাহ তাআলার ঐ কথার প্রতি যাতে তিনি ইহুদীদের বলেছিলেনঃ

﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٞ ۝٥٨ ﴾ البقرة: ٥٨

এবং তোমরা বল, হিততাহ (সূরা আল-বাক্বারাহ ৫৮)

তারা এই শব্দের মধ্যে নুন অক্ষরটি বাড়িয়ে বলেছিল "হিনতা" আর ইহাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তার কথা বদল করেছিল। এই সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمۡ فَأَنزَلۡنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجۡزٗا مِّنَ

ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفۡسُقُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾ البقرة: ٥٩

আর যারা যালিম ছিল তারা ঐ কথা, যা তাদের বলতে বলা হয়েছিল, তা বদলিয়ে বলল। ফলে আমি ঐ যালিমদের উপর তাদের ফাসিকী কার্যের জন্য আসমান হতে আযাব বর্ষণ করি। (সূরা আল বাক্বারাহ ৫৯)

ঠিক তেমনি আল্লাহ বলেন ‘এসতোয়া’ বলতে, আর তারা বলছে এসতা’লা।

খেয়াল করে দেখুন এরা এখানে “লামকে” বাড়িয়েছে যেমন করে ইহুদীরা “নুনকে” বাড়িয়েছিল। (ইহা ইবনে কাইয়ুম রহ. উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তার নিজের জন্য খাস করে এমন কিছু সিফাত রেখেছেন যা তার মাখলুকের কারো মধ্যেই নেই। যেমন গায়েবের এলেম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ ﴿٥٩﴾ ﴾ الأنعام: ٥٩

আর তার নিকট আছে সমস্ত গায়েবের চাবি কাঠি যা অন্য কেহ জানে না। (সূরা আন’আম৫৯)

আর আল্লাহ তাআলা তার রাসূলদের মাঝে মাঝে কিছু গায়েবের কথা জানিয়েছেন ওহীর মাধ্যমে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ﴿٢٧﴾ ﴾ الجن: ٢٦ - ٢٧

তিনি হচ্ছেন গায়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত। অন্য কারো কাছে উহা তিনি প্রকাশ করেননি। তবে রাসূলদের মধ্যে কাউকে কাউকে খুশী হয়ে (জিনিয়েছেন)। (সূরা জিন, ২৬)

বুরদাহ নামক কবিতায় বুছাইরি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে কুফরি ও গোমরাহী প্রকাশ পায়।

তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আপনার দয়াতেই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং চলমান।

আর আপনার এলেম হতেই ল্ওহে মাহফুজ ও কলমের এলেম।

কিন্তু, সত্যিকারভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ও তারই দয়ায়। উহা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়ায় বা তার সৃষ্টির কারণে হয়নি, যেমন ভাবে উক্ত কবি বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ ١٣ ﴾ الليل: ١٣

নিশ্চয়ই আমার জন্যই আখিরাত ও দুনিয়া। (সূরা লাইল, আয়াত১৩)

নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম লওহে মাহফুজে কি আছে তা জানেন না, আর কলম দ্বারা কি লেখা হয়েছে তাও তিনি জানেন না। কিন্তু এই কবি তার বিপরীত বলেছেন।

কারণ এগুলো হচ্ছে এমন গায়েব যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٦٥ ﴾ النمل: ٦٥

হে নবী! আপনি বলুন, আসমান ও জমিনের গায়েব কেহ জানে না আল্লাহ ব্যতীত। (সূরা নমল ৬৫)

আর ওলী-আল্লাহদের তো প্রশ্নই উঠে না যে, তারা গায়েব জানবে। আর ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূলদের যে গায়েবের খবর দিতেন তাও তারা জানতে পারে না। কারণ, ওহী কখনও আউলিয়াদের উপর অবতীর্ণ হয় না। উহা শুধু নবী-রাসূলদের উপর অবতীর্ণ হত। তাই, যে ব্যক্তিই দাবী করবে যে, সে এলমে গায়েব জানে আর যারা তাদের বিশ্বাস করবে, উভয় দলেরই ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন গায়েব জানার দাবীদার ব্যক্তি বা গণক (যারা হাত দেখে) এর নিকট যাবে এবং তারা যা বলে তা বিশ্বাস করবে তবে সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করে কুফরি করল। (বর্ণনায় আহমদ)

এই জাতীয় এলমে গায়েব জানার দাবীদার ও চরম মিথ্যাবাদী দজ্জালরা যা বলে উহা হচ্ছে তাদের ধারনা, এবং শয়তানের ধোকাবাজী। যদি তারা সত্যিই সত্যবাদী হত তবে ইহুদীদের গোপন কথাগুলো আমাদের জানিয়ে দিত। আর জমিনের গুপ্তধনসমূহ বের করে দিত। আর এভাবেই তারা মানুষদের উপর বোঝা হয়ে পড়েছে আর ভন্ডামীর মাধ্যমে তাদের পয়সা গ্রহণ করছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা

ঈমান নষ্ট করে

চতুর্থ ভাগঃ ঈমান নষ্টকারী আমলসমূহের মধ্যে আছে কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করা বা তাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারনা পোষণ করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেঃ

১। আমাদের রাসূলের সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতকে অস্বীকার করা। কারণ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের রোকনের এক রোকন।

২। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কোন খারাপ ধারনা পোষণ করা বা সত্যবাদিতা সম্পর্কে বা আমানত বা পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়া, অথবা কোন ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অথবা তার অবমূল্যায়ন করা অথবা তার কার্য সমূহ যা সাবেত আছে সে সম্পর্কে কোন আজে বাজে কথা বলা।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সহীহ হাদীস সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা অথবা তিনি যাদি কোন সত্য খবর দিয়ে থাকেন তাকে অস্বীকার করা। যেমনঃ দজ্জালের প্রকাশ পাওয়া অথবা ঈসা (আঃ) কে আসমান হতে অবতীর্ণ হয়ে তার শরীয়ত মত বিচার করবেন একথা অস্বীকার করা। এ জাতীয় আরো অনেক কথা যা কোরআন দ্বার প্রমানিত তা অস্বীকার করা।

৪। অথবা কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করা যাদের আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছিলেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে অথবা তাদের সময়ে তাদের সমপ্রদায়ের সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল যা আল্লাহ তাআলা কোরআনে বর্ণনা করেছেন বা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন তা অস্বীকার করা।

৫। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে মিথ্যা নবুয়তের দাবী করে। যেমন- মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী করেছে কোরআন তার দাবীর বিরোধিতা করে বলেছেঃ

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴿٤٠﴾ ﴾
الأحزاب: ٤٠

মুহাম্মদ তোমাদর মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীদের শেষ নবী। (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৪০)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أنا العاقب الذي ليس بعده نبي (متفق عليه)

আমিই শেষ, আমার পর আর কোন নবী নেই। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অন্য কোন নবী আছে, সে কাদিয়ানীই হউক বা অন্য কেহ, তবে সে কুফরি করল এবং তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেল।

৬। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন সব গুণে বিভূষিত করে যা আল্লাহ তাআলা করেননি । যেমনঃ সর্ব ধরনের এলমে গায়েব তিনি জানতেন। যেমনঃ অনেক সুফী পীরেরা বলে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সম্বোধন করে তাদের এক কবি বলেঃ হে সমস্ত গায়েব জাননেওয়ালা! আপনার উপর দরূদ বর্ষিত হউক।

৭। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এমন জিনিস পেতে ইচ্ছা করে যা দেবার মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ নয়। যেমনঃ সাহায্য চাওয়া, বিজয়ের সাহায্য চাওয়া, রোগমুক্তি অথবা এই জাতীয় কার্যসমূহ, যা আজ মুসলিমদের মধ্যে বহু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে সুফীদের মধ্যে। তাদের কবি বুসাইরী বলেনঃ এমনকি গভীর জঙ্গলে কোন সিংহ যদি কারও সম্মুখে এসে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং এমন মুহুর্তে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তবে তিনি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যতবারই সময়ের চক্র আমাকে কষ্টে ফেলেছে আর আমি তার নিকট আশ্রয় চেয়েছি ততবারই উহা তার নিকট হতে পেয়েছি।

আল কোর-আনের দৃষ্টিতে এই জাতীয় কথাগুলো শিরক দ্বারা পূর্ণ। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন।

﴿ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ ١٠ ﴾ الأنفال: ١٠

সাহায্য কখনো আসতে পারে না আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ হতে। (সূরা আনফাল ১০)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও উপরোক্ত ধরণের কবিতার বিরোধিতা করে বলেনঃ

“যদি কিছু চাও আল্লাহর নিকট চাও। আর যিদি সাহায্য চাও তার নিকটেই

চাও (বর্ণনায় তিরমিযি)

তাহলে কিভাবে এটা সম্ভব যে, লোকেরা বলে থাকে, আউলিয়াগণ গায়েবের এলেম জানেন অথবা তাদের জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর নজর নেয়াজ মানত দেয়। আর তাদের জন্য পশু যবেহ কর। আর তাদের কাছে এমন সব জিনিসের দাবী করে যা আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট পাওয়ার আশা নাই। যেমনঃ রিযিক চাওয়া, রোগ মুক্তি চাওয়া ও বিপদে উদ্ধার চাওয়া ও এই জাতীয় অন্যান্য সাহায্য প্রার্থনা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই আমলগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৮। তবে আমরা রাসূলগণের কোন মোজেযাকে অস্বীকার করি না। আর না আউলিয়াগণের কারামতসমূহ অস্বীকার করি। তবে যেটা আমরা অস্বীকার করি তা হল তাদেরকে আল্লাহর শরীক স্থির করা।

আল্লাহর নিকট যেভাবে দু'আ করি তাদের নিকট ও একই ভাবে দু'আ করা কিংবা তাদের জন্য যবেহ করা অথবা তদের জন্য নজর নেয়াজ মানত পেশ করা। এমনকি তাদের কারো কারো মাজার টাকা পয়সা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। আর উহা ঐ মাজারের খাদেম ও পুজারীরা গ্রহণ করে অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করে। আর অন্যদিকে কত ফকির মিসকিন রয়েছে যাদের এক মুষ্ঠি আহার জোটে না।

এক কবি বলেনঃ

আমাদের কত জীবিত ব্যক্তি আছেন যারা এক পয়সাও পায় না। আর অনেক মৃতরা লাখ লাখ টাকা কামাই করে।

অন্যদিকে অনেক ধরনের মাজার, (কবর) জিয়ারতের পবিত্র জায়গার মূল বলে কিছুই নেই। বরং ওগুলো মিথ্যাবাদীদের বানান। এই সমস্ত ধোকাবাজরা ঐগুলো স্থাপন করেছে যাতে করে মানত, নজরানার নামে তাদের নিকট টাকা পয়সা আসে। এর দলীল নিম্নে পেশ করছি।

প্রথম ঘটনা

আমার এক বন্ধু, যার সাথে আমি একত্রে পড়াশুনা করেছি তিনি বলেনঃ সুফীদের একপীর একদা আমার মা'র বাড়ীতে আসেন এবং তার নিকটে চাঁদা চায় একটা নির্দিষ্ট রাস্তায় এক ওলির কবরে সবুজ পাতাকা স্থাপন করার জন্য। তখন তিনি তাকে কিছু টাকা দেন। সে ইহা দ্বারা একটা সবুজ কাপড় খরিদ করে এবং উহা কবরের উপর স্থাপন করে। তারপর লোকদের ডেকে ডেকে বলতে থাকেঃ ইনি আল্লাহর অলিদের একজন। আমি স্বপ্নে

তার দেখা পাই। এইভাবে সে টাকা পয়সা জমাতে শুরু করে। তারপর যখন সরকারের তরফ হতে রাস্তা প্রশস্ত করতে চায় এবং কবরকে উচ্ছেদ করতে চায় তখন ঐ ব্যক্তি, যে এই মিথ্যা কবরকে স্থাপন করেছিল, এই বলে চতুর্দিকে গুজব ছড়াতে লাগল যে, যে যন্ত্র দ্বারা এই মাজার উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল উহা ভেঙ্গে গিয়েছে। কিছু কিছু লোক উহা বিশ্বাসও করে। চতুর্দিকে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সরকারী লোকজন ও এ ব্যাপারে ভয় পেতে শুরু করে। এই দেশের এক মুফতি সাহেব আমাকে বলেন যে, হুকুমতের লোকেরা এক মধ্যরাত্রিতে তার নিকটে এসে বলল, ওমুক অলীর কবরকে অপসারণ করতে হবে। তিনি সেখানে যেয়ে দেখেন সৈন্যরা ঐ জায়গা ঘিরে রেখেছে। তারপর যন্ত্রপাতি এনে কবরকে উচ্ছেদ কারা হয়। এই মুফতী কবরস্থানে প্রবেশ করলেন ভিতরে কি আছে তা দেখার জন্য, কিন্তু তিনি ভিতরে কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন বুঝাতে পারলেন এই কবর মিথ্যা ও বানান।

দ্বিতীয় ঘটনা

আমরা মক্কার হারাম শরীফের এক শিক্ষকের নিকট এই ঘটনা শুনেছিলাম। একদা এক ফকির ব্যক্তি তার মত আর এক ফকিরের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রত্যেকেই তাদের দারিদ্রের ব্যাপারে বহু কথা বলে। তারপর তারা এক অলীর কবরের প্রতি খেয়াল করে দেখে যে, উহা টাকা পয়সা, সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ। তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলে যে, এসো, আমরা একটা কবর বানিয়ে তা এক অলীর নামে প্রচার করি, ফলে আমরা অনেক টাকার মালিক হয়ে যাব

তার বন্ধু তাতে সম্মত হয় এবং তারা একত্রে রাস্তা দিয়ে হাটতে শুরু করে। রাস্তায় দেখে, এক গাধা চিৎকার করছে। তখন তারা তাকে যবেহ করে এবং এক গর্তে তাকে পুতে রাখে। আর তার উপরে এক কবর ও গুম্বুজ তৈরী করে। তখন তাদের প্রত্যেকে ঐ কবরে মাথা ঘষতে থাকে, সিজদা করতে থাকে বরকতের জন্য। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। তারা বলে, ইহা হচ্ছে আল্লাহর অলী হুবাইশ ইবনে তুবাইশের কবর। তার যে কত কেরামত ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ফলে, কবরের নিকটে লোকেরা নজর মানত হিসাবে টাকা পয়সা, সদকাহ ও অন্যান্য দান খয়রাত করতে শুরু করে। এভাবে আস্তে আস্তে

প্রচুর টাকা জমা হয়। একদিন এই ফকিরদ্বয় বসে বসে তাদের টাকা পয়সা ভাগ করতে শুরু করে। ভাগ করতে যেয়ে তাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। তাদের চেচামেচি শুনে লোকেরা জড় হতে শুরু করল। তখন তাদের একজন বললঃ এই অলীর কসম আমি তোমার নিকট হতে কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তখন অন্যজন বললঃ তুমি এই অলীর কসম খাচ্ছ! তুমি ও আমি এটা ভাল করেই জানি যে, এই কবরে এক গাধা আছে যাকে আমরাই দাফন করেছিলাম। লোকেরা তার কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। আর তারা যে নজর নেয়াজ দিয়েছিল তার জন্য আফসোস করতে শুরু করল। তখন তাদের ধমকিয়ে ও তিরস্কার করে লোকেরা তাদের মালামাল ফেরত নিয়ে গেল!!

বাতিল আক্বীদা যা কুফরির দরজাতে পৌছে দেয়

১। যেমন অনেকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তারা দলীল হিসাবে এই বানোয়াট মিথ্যা হাদীসে কুদসী পেশ করে। উহা হলঃ যদি না তুমি হতে তবে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।

ইবনে জাওযী রহ. বলেন ইহা মাউজু বা বানোয়াট হাদীস। আর বুছাইরী যখন এই কবিতা বলে তখন তা মিথ্যাই বলেঃ

যদি তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না হতেন তবে দুনিয়াকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা হত না।

উপরোক্ত আক্বীদা-বিশ্বাস আল্লাহর নিম্মোক্ত কথার খেলাফ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾ الذاريات: ٥٦

নিশ্চয় আমি জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। (সূরা যারিয়াত ৫৬)

এমনকি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পর্যন্ত তিনি তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেন। কারণ তার প্রতিপালক তাকে বলেনঃ

﴿ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ ﴾ الحجر: ٩٩

আপনি আপনার রবের ইবাদত করতে থাকুন যতক্ষণ না আপনার মৃত্যু

এসে উপস্থিত হয়। (সূরা হিজর ৯৯)
আর আল্লাহ তাআলা সমস্ত রাসূলদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ ﴿٣٦﴾ ﴾ النحل: ٣٦

আর নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতদের নিকট এই বলে রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতেদের হতে দূরে থাক। (সূরা নাহল ৩৬)
"তাগুত" হচ্ছে তারা, যাদের ইবাদত করা হয় আল্লাহকে বাদ দিয়ে, আর তারা তাতে রাজী খুশী থাকে।
তাই এখন চিন্তা করে বলুন, কিভাবে কোন মুসলিম ঐ আক্বীদা পোষণ করবে যা কোরআনের বিরোধী ও সমস্ত রাসূলদের কথার বিরোধী?
২। এই কথা বলা যে, আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করেন। আর তার নূর হতেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়। এই আক্বীদা ও বাতিল আক্বীদা। এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। সত্যিই অবাক লাগে, এই কথা যখন মিশরের এক প্রসিদ্ধ আলেম বলেন। তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মাদ মোতাওয়াল্লী আশশারাভী। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আনতা তাসআলু ওয়াল ইসলামু ইয়াজীব" (আপনি প্রশ্ন করুন ইসলাম উত্তর দিচ্ছ)। এতে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর এবং সৃষ্টির শুরু নামক অধ্যায়ে বলেন:
প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে আছেঃ সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করেনঃ আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ হে জাবের, তোমার নবীর নূর।
এই হাদীসে কিভাবে কোরআনের ঐ আয়াতের বিরোধী হতে পারে যাতে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল আদম (আঃ) এবং তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে?

উত্তরঃ কোন জিনিসের পূর্ণতা এবং স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে সর্বদাই কোন উচ্চমানের জিনিস প্রথম সৃষ্টি করা। তারপর উহা হতে নিচের দিকে

যাত্রা করা। তাই এটা বুদ্ধির বোধগাম্য বিষয় হল এই যে, মাটির তৈরী জিনিস আগে সৃষ্টি করা হবে এবং তারপর উহা হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সৃষ্টি করা হবে। কারণ মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন রাসূলগণ (আঃ) আর সমস্ত রাসূলদের মধ্যে উত্তম হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তাই প্রথমে মাটি দ্বারা কোন সৃষ্টি হয়ে পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হতে পারে না। তাই অব্যশ্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এভাবেই জাবের (রাঃ) এর হাদীস সত্য বলে প্রমাণিত হল।

এই ভাবেই তিনি তার অপরিপক্ক বুদ্ধি দ্বারা উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দেন যে, নবীর নূরই প্রথম, তারপর অন্যান্য বস্তু।

প্রথমতঃ শা'রাভীর কথা আল্লাহপ তাআলার কথার বিরোধী। শারাভী বলেছেন, প্রথম মানুষ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ ﴾ ص: ٧١

আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের (মালায়েকাদের) বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা সোয়াদ ৭১)

অন্যত্র তিনি বলেনঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ﴿٦٧﴾ ﴾ غافر: ٦٧

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন প্রথমে মাটি হতে তারপর বীর্য হতে। (সূরা গাফির ৬৭)

এর তাফসীরে ইবনে জরীর (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের পিতা আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তোমাদের সৃষ্টি করেন বীর্য হতে। (মুখতাসার ইবনে জারীর, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩০০)

আর শা'রাভীর কথাও ঐ হাদীসের বিপরীত যাতে বলা হয়েছেঃ তোমরা প্রত্যেকে আদমের সন্তান। আর আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বাজ্জার)

শা'রাভী বলেছেনঃ প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে উচ্চু স্তরের কোন কিছু

সৃষ্টি করে তা হতে নীচু স্তরের জিনিস সৃষ্টি করা। এমনকি কোরআন পাকেও এই জাতীয় মতবাদ পেশ করেছে ইবলিস, যখন সে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল।

﴿ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ ﴾ ص: ٧٦

আমি তার থেকে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে আর তাকে মাটি হতে। (সূরা সোয়াদ ৭৬)

ইবনে কাসির (রঃ) বলেনঃ সে এই দাবী করেছিল যে, সে আদম হতে উত্তম। কারণ তাকে সৃষ্টি করা হয় আগুন হতে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয় মাটি হতে। আর তার ধারনা মতে আগুন মাটি হতে উত্তম। (তাফসীরে কাসির, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ৪৩)

ইবনে জরীর তবারী (রহঃ) বলেনঃ ইবলিস তার রবকে বলে (আমি কখনো আদমকে সিজদা করব না, কারণ আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন। আর আদম কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। আর আগুন মাটিকে পোড়ায় এবং তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। (মুখতাসার ইবনে জরীর, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ২৭০)

এর থেকে প্রমানিত হল সর্বপ্রথমে আদম কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয় এবং তার থেকে পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সৃষ্টি করা হয়। আর তা হল মাটি, যা হতে আদম কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদম (আঃ) এর বংশ ও পুত্র। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (আমি আদমের সন্তানদের সর্দার। (বর্ণনায় মুসলিম)

তৃতীয়তঃ শা'রাভী আরও বলেছেনঃ নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আসলে এ কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং কোরআনে প্রমাণিত আছে, প্রথম মানুষ হলেন আদম। সৃষ্টির মধ্যে আরশ ও কলম সৃষ্টির পরই তাকে সৃষ্টি করা হয়)।

কারণ রাসূলুলআহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সর্ব প্রথমে আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করেন। (বর্ণনায় তিরমিযি)

কোন দলীল বা বুদ্ধি দ্বারাও প্রমাণ হয় না যে, নূরে মুহাম্মদীকে প্রথমে সৃষ্টি

করা হয়েছে। কারণ, আল কোরআন আল্লাহ্ তালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে বলেনঃ

قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

হে নবী!আপনি বলুনঃ আমিতো তোমাদর মত মানুষ, আর আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়। (সূরা কাহাফ ১১০)
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামও বাস্তবে তাই বলেনঃ

إنما أنا بشر مثلكم (رواه أحمد)

আমি তোমাদের মতই মানুষ (বর্ণনায় আহমদ)
সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাপ ও মা হতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার আব্বা ছিলেন আব্দুল্লাহ আর মা ছিলেন আমেনা বিনতে ওহাব। অন্যরা যেমনি ভাবে জন্ম গ্রহণ করে তিনিও তেমনিভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তার দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব।
কোরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, মানুষদের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হলেন আদম (আঃ) আর পদার্থের মধ্যে কলম। এগুলো ঐ কথার বিরোধিতা করে যে, আল্লাহ তাআলার প্রথম সৃষ্টি হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম । কারণ, উহা কোরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী। তবে হাদীসে যা আছে তা হলঃ আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলার নিকট লেখা ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন শেষ নবী। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তাআলার নিকট শেষ নবী বলে লিখিত ছিলাম তখন, যখন আদম (আঃ) মাটিতেই ছিলেন। (বর্ণনায় হাকেম)
এই হাদীসে আছেঃ লিখিত ছিলাম। এতে বলা হয়নি যে, সৃষ্টি করা হয়েছিল।
অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তখনও নবী বলে পরিগণিত হই যখন আদম (আঃ) রুহ ও শরীর উভয়ের মাঝে ছিলেন। (অর্থাৎ সৃষ্টি হন নাই)। (বর্ণনায় আহমদ)
অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে "সৃষ্টির দিক দিয়ে আমি প্রথম নবী, আর প্রেরণের দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী" । এ হাদীসটি দুর্বল হাদীস- বলেছেন

ইবনে কাসির ও শায়খ আলবানী।
উহা আল কোরআন ও পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ কথা। সাথে সাথে উহা বুদ্ধিও বিবেকের বিপরীত। কারণ আদম (আঃ) এর পূর্বে কোন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি।
চতুর্থতঃ শা'রাভী বলেনঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর হতেই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে। তার কথায় বুঝা যায়, আদম (আঃ), শয়তান, মানুষ, জিন, পশুপক্ষী, পোকা মাকড়, জীবাণুও অন্যান্য সমস্ত জিনিসই উহা হতে সৃষ্টি। কিন্তু উহা কোরআনে যে কথা বলা আছে তার বিপরীত কথা। কারণ আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানকে আগুন হতে, আর মানুষদেরকে বীর্য হতে। শা'রাভীর কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামেনর ঐ কথার বিরোধী যাতে তিনি বলেনঃ

خلقت الملائكة من نور . وخلق الجان من مارج من نار . وخلق آدم مما وصف لكم

ফেরেশতাদের (মালাইকাদের) সৃষ্টি করা হয়েছে নূর হতে। আর জ্বীনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা হতে। আর আদম কে ঐ জিনিস হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যা হতে তোমাদের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। (বর্ণনায় মুসলিম)
এতে দেখা যাচ্ছে, শারাভীর কথা বুদ্ধি, বিবেক ও বর্তমান পরিস্থিতি সব কিছুরই বিপরীত। কারণ মানুষ, জীবজন্তু সৃষ্টি হয় গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে। যদি ধরা হয় যে, জীবাণু, বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক পোকা মাকড় এবং এই জাতীয় সমস্ত কিছু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে তবে কেন আমরা ঐ সব ক্ষতিকর জীবাণুকে হত্যা করি। বরং আমাদের হুকুম করা হয়েছে সাপ, মশা, মাছিও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবজন্তু হত্যা করতে।
পঞ্চমতঃ শা'রাভী আরও বলেনঃ জাবের (রাঃ) এর ঐ হাদীস, যাতে বলা হয়েছেঃ "হে জাবের ! সর্ব প্রথম আল্লাহ তাআলা তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেন।"
এই হাদীসটি নবীর নামে মিথ্যা বানান হয়েছে। শা'রাভীর কথা মত ইহা সত্য নয়। কারণ, উহাতে কোরআনের বিরোধী কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি হলেন আদম। আর বস্তুর

মধ্যে কলম। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদমের সন্তান। যাকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তিনি আমাদের মত মানুষ যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। তার বিশেষত্ব হল তিনি নবী ছিলেন এবং তার নিকট ওহী আসত। লোকেরা তাকে নূর হিসাবে দেখেনি বরং মানুষ হিসাবে দেখেছে।

অবশ্য এ বিষয়ে যে হাদীসটি কে শা'রাভী সহীহ বলেছেন তা হাদীস বিশারদদের নিকট মিথ্যা, মাউদু ও বাতিল হাদীস।

৩। আরও বতিল আক্বীদার মধ্যে হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিস তার (নবীর) নূর হতে সৃষ্টি করেছেন, যা বহু সুফীই বলে থাকে। আর শা'রাভী উপরে উল্লখিত তার কিতাবেও উহা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

তার কথা যদি সত্য হয় তবে বলতে হয়, আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিস তার নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তার নূরের রশ্মী হতেই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি বলি, এই কথার প্রমাণে কোরআন, সুন্নাহ বা জ্ঞানের কোন দলীল নেই। আগেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আদমকে মাটি হতে, শয়তানকে আগুন হতে এবং মানুষদেরকে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন। ইহা শা'রাভীর কথার বিরোধিতা করে আর তাকে বাতিলও বলে। আর শা'রাভীর কথার মধ্যে পরস্পর বিরাধীতা রয়েছে। প্রথমে বলেনঃ সমস্ত জিনিস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে। অন্যত্র বলেনঃ সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলার নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই নূরের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। যে সমস্ত জিনিস আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে তাতে আছে বানর , শুকর, সাপ, বিছা, জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতিকারক জীব। তবে কেন আমরা তাদের হত্যা করি?

দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা

হে মুসলিম ভাই ! আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাকে হেদায়েত দান করুন এই জাতীয় কথা হতে যা সুফী পীরেরা বলে থাকে। আর এগুলো কোরআন ও রাসূলের সুন্নাতের বিরোধী। সাথে সাথে উহা বুদ্ধি, বিবেচনারও বিরোধী। আর উহা কুফরি পর্যন্ত পৌছে দেয়।

أَللّٰهُمَّ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببه إلينا، وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه وكرهه إلينا، وأرزقنا إتباع هدي رسول رب العلمين

"আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান, ওয়ার যুকনা ইত্তেবা'আ ওয়া হাবিববহু ইলাইনা ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়ার যুকনা ইজতিনাবান। ওয়া কারিরহু ইলাইনা। ওয়ার যুকনা ইত্তিবা'আ হাদইয়া রাসূলু রাব্বিল আলামীন"।

হে আল্লাহ ! আমাদের হককে হক হিসাবে বুঝতে দিন আর আমাদের এই তৌফিক দিন যাতে তা অনুসরণ করতে পারি। আর তা আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন। আর বাতিলকে বাতিল বলে বুঝতে দিন এবং আমাদের উহা হতে বিরত থাকতে তৌফিক দান করুন। আর উহাকে আমাদর নিকট অপছন্দনীয় করুন। আর আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামেনর হেদায়েত অনুসরণ করতে দিন যিনি হলেন রাব্বুল আ'লামীনের রাসূল। আমীন!

হে আমার মা'বুদ ! আপনিই আমার সাহায্যকারী

হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার সাহায্যকারী কেহ নেই। তাই দয়া করে এই যামানায় আমার সাহায্যকারী বনে যান। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কোন গুপ্তধন নেই। তাই দয়া করে, আমার হস্তদ্বয় যখন খালি হয়ে যায় তখন আপনি আমার গুপ্তধনের ব্যবস্থা করুন। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কোন রক্ষাকারী নেই। তাই যদি কেহ আমাকে বিপদে নিক্ষেপ করে তখন আপনি আমার রক্ষাকারী হয়ে যান। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কোন সম্ভ্রমের বস্তু নেই। তাই যখন কেহ আমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তখন আপনি আমার সম্ভ্রমের ব্যবস্থা করুন।

হে আমার মা'বুদ ! আপনি ভালমতই অবগত আছেন আমার অন্তরে কি আছে। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও কখন, কি করে তা আপনি উত্তমভাবে অবগত আছেন। তাই হে দয়ালু ! মেহেরবানী করে আমার মধ্যে রাজী খুশী ও ধৈর্য্য দান করুন। যদি কদাচিৎ আমার অন্তর বা জিহ্বা দ্বারা কোন ভুল হয়, তাহলে ক্ষমা করুন। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কেহ সম্মানকারী নাই। তাই দয়া করে আমার সম্মান ও অন্তরের আশা আকাংখার দুর্গ বনে যান।

ইসলাম ও ঈমানের অর্থ

প্রশ্নঃ ইসলাম কি?

উত্তরঃ ইসলাম হচ্ছে তাওহীদ কিংবা আল্লাহর একত্ববাদের কথা মনে প্রাণে স্বীকার করে তার নিকট নিজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করা। আর সাথে সথে তার আনুগত্য করা এবং শিরকের যাবতীয় কার্যবলী হতে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

বরং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজকে আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তমভাবে সমর্পন করে আর সে সুন্দরভাবে সৎকর্ম সম্পাদনকারী তার পুরস্কার মিলবে তার রবের নিকট থেকে। তাদের কোন ভয় থাকবে না, আর না হবে তারা দুঃখিত। (সূরা আল-বাক্বারাহ ১১২)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .

ইসলাম হচ্ছে মনে প্রাণে এই স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রেরিত পুরুষ, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসে সিয়াম পালন করা, আর যদি সামর্থ্য থাকে তবে আল্লাহর ঘরে হজ করা।(বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ ঈমান কি?

উত্তরঃ ঈমান হচ্ছে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সাথে সাথে উহা মুখে উচ্চারণ করা এবং অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা আমল করা। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا ﴿١٤﴾ ﴾ الحجرات: ١٤

আরবের বেদুইনেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। হে নবী (তাদের) বলুনঃ তোমরা এখন পর্যন্ত ঈমান আননি, বরং বলঃ আমরা নিজেদের আশা আকাংখাকে আল্লাহর উপর সর্মপন করেছি। কারণ ঈমান এখন পর্যন্ত তোমদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (সূরা হুজুরাত ১৪)

আর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره

ঈমান হল আল্লাহর উপর, তার মালাইকাদের উপর (ফিরিশাতাদের) উপর, তার কিতাবসমূহের উপর, তার রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর, এবং ক্বদর বা ভাগ্যের ভালমন্দের উপর আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। (বর্ণনায় মুসলিম)

ইমাম হাসান আল বসরী (রঃ) (মৃত্যু১১০ হিজরী) বলেনঃ শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা কিংবা বাইরের সাজ পোশাকই ঈমান নয়, বরং উহা হচ্ছে অন্তরের দৃঢ়তা এবং আমল উহাকে সত্যায়িত করে।

প্রশ্নঃ আপনার রব কে?

উত্তরঃ আমার রব হচ্ছে ঐ আল্লাহ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং
প্রতিপালনও করছেন, আর সাথে সাথে সমস্ত মাখলুককেও সৃষ্টি করেছেন এবং তার নিয়ামত দ্বারা লালন পালন করছেন। তিনিই আমার মা'বুদ, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢ ﴾ الفاتحة: ٢

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। (সূরা ফাতিহা ২)

প্রশ্নঃ আপনার দ্বীন বা ধর্ম কি?

উত্তরঃ আমার দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম, আর উহা
ইবাদত ও আনুগত্যের ঐ সমস্ত কথা ও কাজ যা কোরআন ও হাদীস দ্বারা
প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ۝١٩ ﴾ آل عمران: ١٩

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। (সূরা আল ইমরান ১৯)

প্রশ্নঃ আপনার নবী কে?

উত্তরঃ আমার নবী হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। তিনি মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মা হলেন আমিনা বিনতে ওয়াহাব। তিনি সমস্ত মানব জতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ ﴾ الأحزاب: ٤٠

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যের কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীদের শেষ নবী। (সূরা আহযাব ৪০)
যখন তার উপর এই আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি নবী রূপে পরিগণিত হনঃ

﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ ﴾ العلق: ١

পড় তোমার ঐ রবের নামে যিনি (সমস্ত কিছু) সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক ১)
অতঃপর তিনি রাসূল রূপে প্রকাশ পান ঐ সময়, যখন তার উপর নাজিল হয় আল্লাহ তাআলার ঐ বাণীঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ ﴾ المدثر: ١ - ٢

হে চাদরে আবৃত ব্যক্তি ! উঠুন এবং ভয় প্রদর্শন করুন। (সূরা মুদ্দাসেসর ১-২)
আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿١٥٨﴾ ﴾ الأعراف: ١٥٨

আপনি বলুন, হে মানবমন্ডলী ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (সূরা আল আ'রাফ ১৫৮)
তিনি শেষ নবী, তারপর আর কোন নবী ও রাসূল নেই।
তার বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তার উপর ওহী নাজিল হয়। নবূয়ত প্রাপ্তির তের বছর পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এরপর তিনি সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন এবং যখন তার বয়স তেষট্টি বছর তখন তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
তিনি প্রথমে যে কথার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন তা হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। উহা হচ্ছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই। তার প্রভূ তাকে নির্দেশ দেন একমাত্র তার নিকটই দু'আ করতে এবং উহাতে কাউকে শরিক না করতে। তার যামানায় মুশরিকরা দু'আর ভিতরে যে শিরক করত তা হতে তাকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ ﴾ الجن: ٢٠

হে নবী আপনি বলুন, আমিতো একমাত্র আমার রবের প্রার্থনা করি এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করি না। (সূরা জিন, ২০)
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الدعاء هو العبادة (رواه الترمذى)

দু'আ হচ্ছে ইবাদত। (বর্ণনায় তিরমিযী)
তাই মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহকে ডাকা এবং তার সাথে অন্য কাউকে না ডাকা। তা তিনি নবী হউন বা ওলীই হউন, কাউকে দু'আ প্রার্থনায় চশরিক না করা। কেননা, একমাত্র আল্লাহই সমস্ত কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। অন্য যে মৃতরা কবরে শুয়ে আছেন তারা তাদের নিজেদের কষ্টই দূর করতে অপারগ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـًٔا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٍۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ النحل: ٢٠ - ٢١

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে তারা কোন জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা জীবিত নয়, বরং মৃত। এমনকি তাদের ঐ খবরও নেই যে, কবে তাদের পুনর্জীবিত করা হবে।
(সূরা নাহাল ২০-২১)
প্রশ্নঃ আখিরাতে পূণর্জীবন সম্বন্ধে আপনার আক্বীদা বিশ্বাস বা ধারণা কি? আর উহাকে অস্বীকারকারীর হুকুম কি?
উত্তরঃ আখিরাতে পূণর্জীবন সম্বন্ধে আমার আক্বীদা হচ্ছেঃ উহার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। উহা আল্লাহর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে এমন একটি অংশ যা কখনই পৃথক করা যায় না। যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনিই সমস্ত কিছু ধ্বংস হওয়ার পরে ঐ সমস্ত সৃষ্টিকে আবার একই অবয়বে জীবিত করতেও সক্ষম। এই কথাকে অস্বীকার করা কুফরি এবং ঐ অস্বীকারকারী চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। এর দলিল হল আল্লাহ তাআলার ঐ বাণীঃ

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلۡقَهُۥۖ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾ يس: ٧٨ - ٧٩

এবং আমাদের সামনে উদাহরণ পেশ করে, কিন্তু সে তার নিজের সৃষ্টি হওয়াকে ভুলে গেছে। আর বলে, হাড়, অস্হিসমূহ,যা টুকরো টুকরো

হয়ে গেছে, তাকে আবার কে জীবিত করবে? বলুনঃ তিনিই আবার তাদের জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধেই সম্যক জ্ঞাত। (সূরা ইয়াছিন,আয়াত৭৮ও৭৯)।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তির উত্তমভাবে মৃত্যু হওয়ার নিদর্শন কি?

উত্তরঃ উত্তমভাবে মৃত্যু হওয়ার বহু নিদর্শন রয়েছে। উহার কোন একটিও যদি মৃত্যুকালে কারও ভাগ্যে জোটে তবে উহা তার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

এ গুলি হচ্ছেঃ

১। মৃত্যুকালে কালেমা পড়া।

২।জুম'আর রাতে বা দিনে মৃত্যু হওয়া।

৩।মৃত্যুকালে ঘামে কপাল সিক্ত হওয়া।

৪।ধর্মীয় যুদ্ধে বা জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়া।

৫।আল্লাহর রাস্তায় গাজী হয়ে মৃত্যু বরণ করা। এর অর্ন্তভুক্ত হলোঃ প্লেগে মৃত্যু বরণ করা, পেটের পীড়া, বমি, পেট ফাপা, অথবা কলেরায় মারা যাওয়া।

৬।পানিতে ডুবে অথবা আগুনে পুড়ে মারা গেলে।

৭। প্রসবকালীন অবস্থায় কোন মহিলা মৃত্যু বরণ করলে।

৮। পক্ষাঘাত (অর্ধাঙ্গ অবশ) রোগে মারা গেলে।

৯। পিঠের পীড়া, যেমন পাঁজরে ব্যাথার কারণে মারা গেলে।

১০। নিজের দ্বীন, জীবন, কিংবা সম্পদদের হেফাজত করতে যেয়ে মারা গেলে।

১১। জিহাদের ময়দানে পাহারারত অবস্থায় মারা গেলে।

১২। কোন নেক কাজ করার সময় মারা গেলে। যেমন, কলেমা পড়ার সময়, সিয়াম পালন অবস্থায়, দান খয়রাত করার সময় ইত্যাদি।

এ সবকটি বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীসের প্রমাণ আছে

অন্য একটি রেওয়াতে আছে, শহীদ সাত শ্রেণীরঃ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী, নিওমোনিয়া রোগে মৃত্যু প্রাপ্ত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি, কোন কিছু চাপা পড়ে মৃত্যু প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রসব কালীন মৃত মুহিলা। (হাদীসটি ইমাম হাকেম সহীহ বলেছেন এবং হাফেজ যাহাবী হাকেমের সহীহ বলাকে

সমর্থন করেছেন।)

বান্দার উপর আল্লাহর হক

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের (দাসত্বের) জন্য এবং আমরা যেন তার সাথে কোন কিছুকে শরিক বা অংশীদার না করি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ الذاريات: ٥٦ - ٥٨

এবং নিশ্চয়ই জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য। (সূরা যারিয়াত ৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে এই যে, তারা তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ ইবাদত বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ইবাদত হল ঐ সব কথা ও কাজের সমষ্টির নাম যা আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন। যেমনঃ দুআ, সালাত, খুশু বা আল্লাহর ভয় এবং এই জাতীয় অন্যান্য আমল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣

হে রাসূল আপনি বলুনঃ নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার হজ, আমার হায়াত এবং আমার মৃত্যু একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। (সূরা আন'আম ১৬

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ،

আমার বান্দা সর্বাধিক নৈকট্য হাসিল করে আমার পছন্দনীয় ঐ সমস্ত আমলের দ্বারা যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (হাদীসে কুদসী বর্ণায় বুখারি)

প্রশ্নঃ ইবাদতের শ্রেণী কি কি?

উত্তরঃ ইবাদতের অনেক বিভাগ রয়েছেঃ তার মধ্যে আছে দুআ, ভয়,

আশা, তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। কোন কিছু পাবার আশা, যবেহ, নজর বা মানত, রুকু, সিজদা, তাওয়াফ, দান-সদকা ইত্যদি। এছাড়া আরো নানা ধরনের শরিয়ত সম্মত ইবাদত রয়েছে।

প্রশ্নঃ আমরা কি ভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবো?

উত্তরঃ আমরা ঐ ভাবেই ইবাদত করব যেভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে তারা আমাদের অন্যান্য যা নির্দেশ দিয়েছেন তাও অনূসরণ করব। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣ ﴾ محمد: ٣٣

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট করনা। (সূরা মুহাম্মদ ৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه مسلم)

যে কেহ এমন কোন আমল করবে যা প্রতি আমার হুকুম নেই, উহা গ্রহণযোগ্য নয়। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ আমরা কি আল্লাহর ইবাদত করব ভয় ও আশা নিয়ে?

উত্তরঃ হাঁ, আমরা ঐভাবেই তার ইবাদত করব। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ ٥٦ ﴾ الأعراف: ٥٦

তোমরা আল্লাহকে ডাক ভয় ও আশার সাথে। (সূরা আ’রাফ ৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار (رواه أبوداود)

আমি আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি চাই। (আবু দাউদ)

প্রশ্নঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে ইহসান কি?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে, সর্বদা মনে এই খেয়াল রাখা যে, আল্লাহ তাআলা একাই আমাদের সমস্ত কিছু সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ ﴾ الشعراء: ٢١٨ - ٢١٩

তুমি যখন (সালাতে) দাড়াও তখন তিনি তোমাকে দেখেন এবং রুকু সিজদার মধ্যেও তিনি তোমার উঠা-বসা খেয়াল করেন। (সূরা শূয়ারা ২১৮-২১৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الإحسان أن تعبد الله كانك تره فان لم تكن تراه فانه يراك (رواه مسلم)

ইহসান হচ্ছে তোমার প্রভুর ইবাদত কর এমন ভাবে যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি দেখতে নাও পাও তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হকের পর কার হক সবচেয়ে বড়?

উত্তরঃ মাতাপিতার হক। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴾ الإسراء: ٢٣

আর তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যখন তাদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে পৌছেন তখন তাদের সামনে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না। আর তাদের ধমকও দিবে না, আর তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। (সূরা ইসরা ২৩)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বল্লেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ! মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বড় হকদার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তারপর কে! উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। লোকটি

আবার প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি শেষ বার প্রশ্নের উত্তরে বললেনঃ তোমার পিতা। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)

তাওহীদের শ্রেণী বিভাগ ও তৎপর্য

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা রাসূলদের কেন প্রেরণ করেছিলেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রেরণ করেছিলেন একমাত্র তার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিতে এবং তার সাথে যাবতীয় শিরক করা হতে বিরত থাকতে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾ ﴾ النحل: ٣٦

নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূলদের প্রেরণ করেছি এ জন্য যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতদের (শয়তান) ইবাদত হতে বিরত থাকবে। (সূরা নাহাল ৩৬)

তাগুত হচ্ছে, মানুষ যাদের ইবাদত করে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার নিকটে দুআ করে এবং সে তাতে রাজী খুশি থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

والأنبياء إخوة ودينهم واحد (متفق عليه)

আম্বিয়াগণ (আঃ) প্রত্যেকে একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। (সৎ ভাই), আর তাদের দ্বীনও এক। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসীলিম)

অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূলই আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকছেন।

প্রশ্নঃ আল্লাহ যে রব, তার একত্ববাদ কি?

উত্তরঃ উহা হল আল্লাহকে তার কাজে একক মনে করা। যেমন সৃষ্টি, মহা-জগত পরিচালনা করা, ব্যবস্থাপনাসহ ও অন্যান্য কার্যসমূহে তাকে একক বলে জানা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ ﴾ الفاتحة: ٢

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক (সূরা ফাতিহা ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أنت رب السموات والأرض(متفق عليه)

আপনি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)
প্রশ্নঃ আল্লাহ যে উপাস্য তার একত্ববাদ কি?
উত্তরঃ তা হচ্ছে তার ইবাদতে একত্ববাদ প্রকাশ করা। যেমন দু'আ, বিপদে আপদে আল্লাহকে ডাকা আর তারই নামে যবেহ করা, কেবল তারই নামে নযর (মানত) মানা, তারই নিকট বিচার প্রার্থী হওয়া এবং তারই বিচার গ্রহণ করা, তারই জন্য সালাত আদায় করা সব কাজে তারই উপর আশা ভরসা করা, সব বিষয়ে তাকেই ভয় করা, সমস্ত কাজে তারই সাহয্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ ﴾ البقرة: ١٦٣

আর তোমাদের মাবুদ এক। তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি দয়ালু ও সবর্দা দয়াবান। (সূরা বাক্বারাহ,আয়াত-১৬৩)
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا أله إلا الله (متفق عليه)

"সর্ব প্রথম যে কথার প্রতি তুমি তাদের দাওয়াত দিবে তা হলো কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। (বুখারী ও মুসলিম)
বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিবে।

প্রশ্নঃ ইবাদত ও রব হওয়ার ব্যাপারে একত্ববাদের উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ এর মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষ তাদের প্রতিপালক এবং মা'বুদের মহত্বের পরিচয় পেয়ে তাদের ইবাদতে একমাত্র তাকেই একক ভাবে গ্রহণ ও প্রচার করবে। আর সাথে সাথে তাদের চলার পথে সেই রবেরই আনুগত্য করবে যেন ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেথে যায়। মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে তার উপরই আমল করবে, ফলে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হবে।
প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলার সিফাত (গুণ) ও উত্তম নামসমূহের ক্ষেত্রে তাওহীদ কি?
উত্তরঃ উহা হচ্ছে ঐ সমস্ত গুণাবলীকে মেনে নেয়া যা আল্লাহ তাআলা

নিজের সম্পর্কে তার কিতাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। উহা যেমন ভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কোন বিকৃত ব্যাখ্যা, উদাহরণ, তুলনা, অস্বীকার অথবা কোন স্বরূপ (নিজস্ব) কল্পনা ব্যতীত। যেমনঃ এসতোয়া (বসা), নযুল (অবতীর্ণ হওয়া), ইত্যাদি। উহাদের প্রতিটিই আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণতার সাথে সমঞ্জস্য পূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴾ الشورى: ١١

তার মতো কেউ নয় এবং তিনি সমস্ত কিছু দেখেন ও শুনেন। (সূরা শুরা ১১)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا (رواه مسلم)

আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। (বর্ণনায় মুসলিম)

তিনি যে অবতরণ করেন তা তাঁর মহান সত্বার জন্য যেমন প্রযোজ্য সে অনুযায়ী। উহা তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হতে পরে না।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কোথায় আছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহের উর্দ্ধে আরশের উপর আছেন। আল্লাহ তাআলা যেমন নিজেই বলেনঃ

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ ﴾ طه: ٥

রহমান (আল্লাহ তাআলা) আরশের উপর আছেন। (সূরা ত্বাহা, ৫)

"উপরে" এবং "উচ্চে" আছেন যেমন বুখারী শরীফে তাবেয়ীনগণ হতে বর্ণিত হয়েছে। এর সত্যায়ন পাই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত হাদিসে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش (متفق عليه)

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এক কিতাব লিখেছেন, আর উহা তাঁর

নিকট আরশের উপর আছে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ যে আরশের উপর আছেন এ কথা যে ব্যক্তি অস্বীকার করলো সে যেন আল্লাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো। আর আল্লাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করাই কুফরী করা।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কি আমাদের সাথে সব জায়গায় আছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ আমাদের সব অবস্থা সব সময় জানেন, শুনেন ও দেখেন। তিনি আছেন আমাদের দেখার মাধ্যমে এবং শুনার মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ ﴾ طه: ٤٦

তিনি (আল্লাহ) মুসা ও হারুনকে বললেন, তোমরা ভয় পেয় না, আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের কথা শুনি ও দেখি। (সূরা ত্বাহা, ৪৬)

إنكم تدعون سميع قريبا وهومعكم (رواه مسلم)

নিশ্চয় তোমরা এমন সত্বাকে ডাকছ যিনি খুবই নিকটে তোমাদের কথা শুনেন এবং তিনি তোমাদের সাথে আছেন। অর্থাৎ ইলমের মাধ্যমে। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ তাওহীদের উপকারিতা কি?

উত্তরঃ তাওহীদের উপকারিতা হল আখিরাতের চিরস্থায়ী আযাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আর দুনিয়াতে হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়া এবং গুনাহখাতে মাফ হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ الأنعام: ٨٢

যারা ঈমান আনবে এবং তার সাথে কোন জুলম (শিরক) মিশ্রিত করবে না তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হচ্ছেন হিদায়াত প্রাপ্ত। (সূরা আন'আম ৮৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

حق العباد على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيئا ك(متفق عليه)

আল্লাহর উপর বান্দার হক হল এই যে, বান্দা কোন শিরক করবে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তাকে কোন আযাব না দেয়া। (বর্ণনায় বুখারি ও মুসলিম)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ ও শর্তসমূহ

প্রশ্নঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ এবং এর শর্তসমূহ কি কি ?

উত্তরঃ জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আপনাকেও হিদায়েত দান করুন. নিশ্চয়ই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো জান্নাতের চাবি। কিন্তু প্রতিটি চাবিরই দাঁত থাকে। যদি এমন কোন চাবি নিয়ে আসেন যার দাঁত আছে তবে তা দ্বারা (তালা)খুলতে পারবেন, উহা ব্যতীত খুলতেই পারবেন না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাঁতসমূহ হলো নিম্ন লিখিত শর্তসমূহঃ

১।ইলমঃ ইহার অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমস্ত গাইরুল্লাহকে মাবুদ বলে অস্বীকার করা এবং একমাত্র আল্লাহকে মা বুদ বলে স্বীকার করা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴿١٩﴾ ﴾ محمد: ١٩

আর জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা বুদ নেই। (সূরা মুহাম্মদ,আয়াত ১৯)

আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ যথাথই অনুধাবন করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই বলেনঃ

من مات وهو يعلم انه لاإله دخل الجنة (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, জীবিত অবস্থায় সে জানত, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা বুদ নেই, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে । (মুসলিম)

২।ইয়াকিন, যা সন্দেহকে দূর করে অর্থাৎ অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ইয়াকিন পূর্ণভাবে থাকতে হবে, কোনরুপ সন্দেহ থাকলে হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ ﴿١٥﴾ ﴾ الحجرات: ١٥

সত্যিকারের মুমিন হচ্ছে তারাই,যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং ঈমান আনার পর তাতে কোনরুপ সন্দেহ পোষণ করে না ।

(সূরা হুজুরাত,আয়াত-১৫)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণীর প্রতিধ্বনী করে বলেনঃ

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . لا يلقي الله بهما عبد ، غير شاك فيهما ، إلا دخل الجنة " .

আমি এই স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবুদ নেই এবং আমিই তার রাসূল”- যে ব্যাক্তি এতে কোন রকম সন্দেহ পোষন না করে আল্লাহর নিকট উপস্হিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে)। (মুসলিম)
৩।কবুল করাঃ তাতে আছে, উহা অন্তর ও জিহ্বার দ্বারা স্বীকার করা। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের অবস্হা বর্ণনা করে কলেনঃ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ ﴾ الصافات: ٣٥ - ٣٦

যখনই তাদের বলতে বলা হতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখনই তারা সাথে সাথে অহংকারে মুখ ঘুরিয়ে নিত এবং বলতো-আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা বুদদের পরিত্যাগ করবো । (সুরা ছাফফাত, আয়াত- ৩৫ও৩৬)
ইবনে কাসির এ আয়াতের তফসীরে বলেনঃ যেমন ভাবে মুমিনগণ উহা উচ্চারণ করতেন ঠিক তার বিপরীত ভাবে কাফিররা উহা বলতে অস্বীকার করত অহঙ্কারের কারণে। কালেমার গুরুত্ব যে কতখানি তার আরও ব্যাখ্য পাই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ চর্চা করলে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله

আমাকে হুকুম করা হয়েছে,যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে। আর যখন কেউ তা মেনে নেবে ও মুখে উচ্চারণ করবে তখন সাথে সাথে তার জান ও মাল আমার পক্ষ থেকে রক্ষা পেল। তবে ইসলামের যে হকসমূহ আছে তা আদায়

করতে হবে। আর তার হিসাব নিকাশ করবেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা)। (বুখারীও মুসলিম)
৪। আত্মসর্মপণ ও অনুসরণ করাঃ ঐ ভাবে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও অনুসরণ করত হবে ঠিক যে ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ ﴿٥٤﴾ ﴾ الزمر: ٥٤

আর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তার নিকট সম্পুর্ণরূপে আত্মসমর্পন করো। (সূরা যুমার আয়াত-৫৪)
৫। সত্যবাদিতা,যা মিথ্যার বিপরীতঃ উহা হচ্ছে খাটি দীলে সর্বান্তঃকরণে কালেমাকে উচ্চারণ করতে হবে । আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাবধান করে বলেনঃ

﴿ الٓمٓ ﴿١﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾ ﴾ العنكبوت: ١ - ٣

আলিফ, লাম,মিম। তারা কি এ ধারণা করেছে যে,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই ছাড়া পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? নিশ্চয়ই আমি পূর্বের যামানার লোকদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী)। (সূরা আনকাবুত,আয়াত১-৩)
এরই স্বপক্ষে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সান্তনা দিয়ে বলেনঃ

وما من احد يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار (متفق عليه)

যদি কেহ অন্তরে হতে খাটি ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল, তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)
৬। ইখলাসঃ উহা হচ্ছে নিয়তকে শুদ্ধ করে সমস্ত ধরনের শিরক হতে নিজকে বাচিয়ে রেখে নেক আমল করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (سورة البينة : ٥)

আর তাদের হুকুম করা হয়েছে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে। (সূরা বাইয়িনাহ, আয়াত ৫)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

اسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه

(رواه البخاري)

কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করেন অন্তর দিয়ে ইখলাসের সাথে। (বুখারী)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

ان الله حرم على النار من قال لا إله الا الله يبتغي بذالك وجه الله عز وجل

(رواه مسلم)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য জহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন যিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন একমাত্র আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য। (মুসলিম)
৭। কালেমা তৈয়েবার প্রতি ভালবাসাঃ মানুষের কাছে কালেমার দাবী হল এই যে, যে সমস্ত মুমিন উপরোক্ত শর্তসমূহ মান্য করবে শুধু তাদেরকেই মানুষ ভালবাসবে এবং যারা উহা অমান্য করবে তাদেরকে ঘৃণা করবে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ ﴾
البقرة: ١٦٥

এবং মানুষদের মধ্যে এমন এক দল আছে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মা’বুদকে (শরিক) এমনিভাবে ভালবাসে যেমন ভাবে আল্লাহকে ভালবাসা উচিৎ। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সর্বোচ্চ ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহর জন্য। (সূরা বাক্বারাহ ১৬৫)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : ان يكون الله ورسوله احب إليه

مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار (متفق عليه)

তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ব্যক্তি ঐ গুণের কারণে ঈমানের স্বাদ পাবে। প্রথমতঃ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট সমস্ত কিছু হতে সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হবেন।

দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তিকে ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন কারণে নয়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা তাকে কুফরী হতে নিষ্কৃতি দেয়ার পর আবার তাতে প্রত্যাবর্তন করা তার নিকট এ রকম অপছন্দনীয় যে রূপ অপছন্দনীয় আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

(এই অংশটি ডঃ মুহাম্মদ সা'য়ীদ আল কাহ-তানীর "আল ওলা ওয়াল বারা" হতে উদ্ধৃত)।

৮। তাগুতের প্রতি কুফরী করাঃ তাগুত হচ্ছে ঐ সমস্ত বাতিল উপাস্য যাদেরকে ইবাদত করা হয় আল্লাহকে ছেড়ে, যদিও সে অবস্থায় একমাত্র আল্লাহকে রব এবং সত্যিকারের মাবুদ বলে স্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ﴿٢٥٦﴾

﴿ البقرة: ٢٥٦

আর যে ব্যক্তি তাগুতদের অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে নিশ্চয়ই সে এমন এক মজবুত বন্ধনকে আকড়ে ধরল যা ছুটবার নয়। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই আলোকে ঘোষণা করেনঃ

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি অন্তর হতে বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মা'বুদের ইবাদতকে অস্বীকার করে তার প্রাণ ও সম্পদ (নষ্ট করা) অন্যের উপর হারাম। (বর্ণনায় মুসলিম)

আক্বীদাও তাওহীদের গুরুত্ব

প্রশ্নঃ দ্বীনের অন্যান্য কাজ হতে আমরা তাওহীদের গুরুত্ব কেন বেশী দেই ?

উত্তরঃ আমরা যে তাওহীদের বিশেষ গুরুত্ব দেই তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে।
১। তাওহীদ হচ্ছে শিরকের বিপরীত। উহা হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি সমূহের মধ্যে বিশেষ ভিত্তি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আর তা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্বাক্ষীর মধ্যে প্রকাশ পায়।
২। তাওহীদ হচ্ছে ঐ জিনিস যা উচ্চারণের কারণে একজন কাফির ইসলামে দাখিল হয়, ফলে তাকে হত্যা করা যাবে না। আর যদি কোন মুসলিম উহা (তাওহীদ) অস্বীকার করে অথবা ঠাট্টা তামাশা করে তখন সে দ্বীন হতে বের হয়ে যায়।
৩। তাওহীদ হচ্ছে সমস্ত রাসূলদের দাওয়াতের মূল কথা যার দিকে তাঁরা তাদের উম্মতদের দাওয়াত দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ ۝٣٦ ﴾ النحل: ٣٦

এবং নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট এই বার্তা নিয়ে রাসূলদের প্রেরণ করেছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতদের হতে দূরে থাক। (সূরা নাহাল ৩৬)
৪। এই তাওহীদের কারণেই আল্লাহ তাআলা সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ ﴾ الذاريات: ٥٦

নিশ্চয়ই আমি জ্বীন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ৫৬)
আয়াতে ইবাদত অর্থ আল্লাহর একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়তা প্রকাশ করাকে বুঝানো হয়েছে।
৫। তাওহীদ এমন এক ব্যাপক অর্থ সম্বলিত শব্দ যার মধ্যে সামিল আছে রবুবিয়াত, উবুদিয়াত, হুকুম আহকাম, আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ এবং পরিপূর্ণ সিফাত, আর সমস্ত ধরণের ইবাদত।
৬। তার গুণবিশিষ্ট নাম ও গুণাবলী সম্পর্কীয় তাওহীদের গুরুত্ব অনেক বেশী। লেখক বলেনঃ একদা এক মুসলিম যুবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে বলেছিলঃ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক স্থানে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। আমি তাকে বল্লামঃ যদি মনে কর, তার জাত সর্বত্র বিরাজমান তবে ইহা বড় ভুল ধারণা। কেননা আল্লাহ

তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥ ﴾ طه: ٥

নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমান আরশের উপর সমাসীন।। (সূরা ত্বাহা ৫)
আর যদি ধারনা করে থাক যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথেই আছেন, আমাদের কথা শ্রবন করেন, আমাদের অবস্থা জানেন ও দেখেন। তাহলে ইহা সঠিক কথা। আমার এই বিশ্লেষণে ঐ যুবক খুশি হয়ে তা মেনে নিল।

৭। তাওহীদের উপরই নির্ভর করছে মানুষের ইহজগত ও পরজগতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য।

৮। তাওহীদের কারণেই আরবের লোকেরা শিরক, জুলুম, মূর্খতা ও দলাদলি হতে বের হয়ে ন্যায়-পরায়ণতা, সম্মান, জ্ঞান-গরিমা, ঐক্য ও সাম্য অর্জন করেছিল।

৯। তাওহীদের মাধ্যমেই মুসলিমগণ রাজ্যসমূহ জয় করেছিল। যারা ছিল অত্যাচারী, শয়তানের দাস ও তাগুতদের ইবাদতকারী তার হয়েছিল এক আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী। সাথে সাথে তারা বিকৃত দ্বীন ধর্মের জুলুম হতে বের হয়ে প্রবেশ করেছিল ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার স্বর্ণযুগে।

১০ তাওহীদের মাধ্যমেই মুসলিমগণ জিহাদ, আত্মোৎসর্গ এবং জানমাল কোরবান করায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিল।

১১। তাওহীদ আরব ও অনারবকে একসূত্রে গ্রথিত করে একই কাতারে সামিল করে। তাই দেখতে পাই, তাওহীদের যে পুনঃ দাওয়াত দিয়েছিলেন মুজাদ্দেদে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, তা হাজীদের মাধ্যমে যখন পাক-ভারতে পৌছে তখন ইংরেজেরা খুবই ভয় পেয়ে যায়। কারণ ইংরেজেরা বুঝেছিল যে, এ দাওয়াত পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার সমস্ত মুসলিমদের একতাবদ্ধ করে দেবে এবং যেসব দেশ তারা জবর দখল করে আধিপত্য কায়েম করেছি ঐ সমস্ত দেশ হতে মুসলিমরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে। তাই ইংরেজরা তাদের অনুসারীদের নিয়ে এই তাওহীদের দাওয়াতর মুকাবিলা করতে থাকল। আর তারা এই তাওহীদের দাওয়াতের নাম পাল্টিয়ে প্রচারণা চালাতে থাকল “ওহাবী মতবাদ” বলে। যাতে মুসলিমরা তাওহীদী দাওয়াত হতে দূরে সরে থাকে। শায়েখ আলী আত তানতাভী তার “শহীদ আহম্মদ ওরফান” এবং “মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহব” নামক কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

১২। তাওহীদ মানুষের শেষ অবস্হান কোথায় হবে তা নির্ধারণ করে। যদি সে একত্ববাদী হয় তবে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যদি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়

তবে সে হবে জাহান্নামী।
১৩। তাওহীদের কারণেই যুদ্ধ, জিহাদ ঘটে। ঐ রাস্তাতেই মুসলিমরা শাহাদাৎ বরণ করেন। উহার কারণেই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর তাওহীদের কারণেই মুসলিমগণ আজও পর্যন্ত যুদ্ধ, জিহাদ করছে। তাদের কোন ইজ্জত লাভ হবে না অথবা সাহায্য আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাওহীদকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের উষালগ্নে এই তাওহীদই মুসলিমদের একত্রিত করেছিল এবং বিশাল ইসলামীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।
বর্তমানেও মুসলিমগণ তাদের পূর্ব গৌরব-সম্মান এবং রাষ্ট্রকে ফিরে পেতে পারে যদি তারা তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ﴾ محمد: ٧

হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে (আল্লাহর দ্বীনকে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা কে দৃঢ় রাখবেন। (সূরা মুহাম্মদ ৭)
প্রশ্নঃ দ্বীন ও আক্বীদা মানুষের জন্য কেন আবশ্যকীয়?
উত্তরঃ মানুষ প্রকৃতিগত কারণেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী। তাকে সমস্ত ধরণের ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার খুশির জন্য। মানুষ তার স্বভাবজাত অভ্যাস অনুযায়ী কখনও চায় না যে, সামান্য অবহেলিত বস্তু- পদার্থের মত বেচে থাকুক। এজন্য অবশ্যই তার আল্লাহ্ প্রদত্ত আক্বীদার জ্ঞান থাকা দরকার যা তাকে তার চতুস্পার্শ্বের জিনিসের ব্যাখ্যা দেবে এবং তার অবস্থান ও শক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেবে এবং তার সমস্ত কার্যকলাপকে নিয়মের মধ্যে এনে দেবে। সাথে সাথে তার জন্য সরল সঠিক এক রাস্তা বের করে দেবে যা তার দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হবে। এই আক্বীদাই হচ্ছে তার জন্য স্পষ্ট আলোকবর্তিকা স্বরূপ, যার থেকে বের হয়ছে হুকুম আহকাম ও শরিয়তের নিয়মাবলী। যাতে করে মানুষ চলার রাস্তাকে নির্দিষ্ট করে খুজে পায় এবং তাকে পৌছায় এমন এক নিরাপত্তা ও দৃঢ়তায় যাতে আছে তার জন্য হিদায়াত ও নূর আর বিজয় ও কামিয়াবী।
আল্লাহ তালা বলেনঃ

﴿ صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ﴾ البقرة: ١٣٨

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম । আল্লাহর রং অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর কে আছ? আমরা সকলেই তার বান্দা।। (সূরা বাক্বারাহ ১৩৮)

প্রশ্নঃ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দাতা (দায়ী) এবং ইসলামী দলগুলোর উপর ওয়াজিব কি?

উত্তরঃ আল্লাহর প্রতি আহবানকারী ইসলামী জামাআতের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কিতাব ও সহী সুন্নাত মুতাবেক জীবন যাপন করা। আর তাদের দাওয়াতের কাজ ঐ ভাবে শুরু করা যেভাবে সমস্ত নবী ও রাসূলগণ শুরু করেছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমাদের নবী সায়্যেদানা মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কবুল করার জন্য। এই কালেমার অর্থ হচ্ছে –আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তের বছর যাবত মক্কায় এই কালেমার দিকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ ভাবেই আস্তে আস্তে তার সাহাবা (রাঃ) কিরামের মধ্যে ইবাদত কি জিনিস সে ধারণা দৃঢ়ভাবে তাদের অন্তরে গেথে যায়। তারা বুঝতে পারেন, দুআ, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে নিবেদন করা চলবে না। কারণ একমাত্র তিনিই সব কিছু করার মালিক, অন্যেরা অসমর্থ। আর শরিয়তের হুকুম আহকাম প্রবর্তন করা এবং বিচার করার মালিক আল্লাহ তাআলা। কারণ, তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা। আর বান্দার মঙ্গলও উপযোগী কর্ম সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন এবং লোকদের জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য আহবান করেন, যাতে আল্লাহ্ তাআলার কালেমা ও বাণী সমুন্নত হয়।

মুসলিম হওয়ার শর্তসমূহঃ

প্রশ্নঃ মুসলিম হওয়ার শর্ত কি?

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে মুসলিম হতে পারে না যদি না তার মধ্যে নিম্মোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া যায়ঃ-

১। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং একত্ববাদের যে ওয়াজিবসমূহ আছে তার উপর আমল করতে হবে।

২। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাদের জন্য যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তাকে সত্য বলে মানতে হবে এবং তিনি যা হুকুম করেছেন তার ও আনুগত্য করতে হবে। আর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকতে হবে।

৩। মুশরিক ও কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। এমন কিছু মুসলিম আছে যারা নিজেরা শিরক করে না বটে, কিন্তু মুশরিকদের সাথে ধর্মীয় ব্যাপারে শত্রুতাও পোষণ করে না। ফলে, উক্ত কারণে সে মুসলিমও হতে পারে না। কারণ প্রত্যেক রাসূলদের (আঃ) যে মূল কথা ছিল, তা সে বাদ দিয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) তার কাওমের লোকদের বলেনঃ

﴿ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ ﴿٤﴾ ﴾ الممتحنة: ٤

আমরা তোমাদের সাথে কুফরী করছি আর আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়েছে এবং তা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। (সূরা মুমতাহিনাহ ৪)

উপরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের সাথে শত্রুতা শুরু হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্রথমে শত্রুতা করাটাই আমল। দেখা যায়, অনেক মুসলিম কাফিরদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, কিন্তু শত্রুতা পোষণ করে না। মুসলিম হিসাবে তার উপর যা ওয়াজিব ছিল তা সে পালন করে না। এজন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ উভয়কেই প্রকাশ করতে হবে। শুধু মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করলেই চলবে না বরং কাজ-কর্মের মাধ্যমেও প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা ও সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। আর যদি তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক বজায় রাখা হয় তবে বুঝতে হবে তাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই।

৪। উপদেশ দানঃ যে ব্যক্তি বলে যে, মুসলিমেদের মধ্যে কেউ যদি শিরক্, কুফর কিংবা যত পাপই করুক না কেন তার সাথে শত্রুতা পোষণ করব না। তাহলে সে প্রকৃত মুসলিম নয়। বরং তাদের জন্য ওয়াজিব হল মুসলিমদের উপদেশ দেয়া আর শিরক, কুফর আবং পাপ কার্যের বিষয়ে তাদের সাবধান করা, ভদ্র ও নম্র ভাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ ﴿١٢٥﴾ ﴾ النحل: ١٢٥

তুমি তোমার রবের রাস্তায় লোকদের দাওয়াত দিতে থাকো হিকমতের সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে তর্ক করো উত্তম ভাবে ।

(সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)

আমল কবুল হওয়ার শর্তসমূহ

প্রশ্নঃ আমল কবুল হওয়ার শর্তসমূহ কি কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলার নিকট আমল কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে চারটি।

১। আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা এবং তাওহীদকে স্বীকার করা। আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ ﴾ الكهف: ١٠٧

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের ঠিকানা হবে জান্নাতুল ফিরদাউস। (সূরা কাহাফ ১০৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলেনঃ

قل امنت بالله ثم استقم (رواه مسلم)

বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। (বর্ণনায় মুসলিম)

২। ইখলাসঃ উহা হচ্ছে, শুধুমাত্র লোক দেখানো অথবা সুনাম আদায়ের জন্য কাজ না করে একমাত্র আল্লাহর জন্য কাজ করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿٢﴾ ﴾ الزمر: ٢

আল্লাহর ইবাদত করো, দ্বীনের প্রতি ইখলাস রেখে। (সূরা যুমার ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইখলাসওয়ালাদের প্রতি সুসংবাদ দিয়ে বলেনঃ

من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة (رواه البزار)

যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বর্ণনায় বাজ্জার)

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তরীকা বা পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন শুধুমাত্র সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴿٧﴾ ﴾ الحشر: ٧

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যা করতে বলেন তাকে আঁকড়ে ধর। আর যা করতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত হও। (সূরা হাশর ৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে কেউ ঐ সমস্ত 'আমল করবে যাতে আমাদের হুকুম নেই উহা বতিল বলে গণ্য হবে। (বর্ণনায় মুসলিম)

৪। ঈমানদার ব্যক্তি এমন কোন শিরক বা কুফর 'আমল করবে না যাতে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কোন অবস্থাতেই তার ইবাদতের কোন অংশ গাইরুল্লাহর জন্য ব্যয় করবে না। সে নবী, রাসূল, অলি (তাদের মৃত্যুর পর) অথবা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির নিকট দু'আ করবে না বা সাহায্য চাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দু'আ হচ্ছে ইবাদত। (বর্ণনায় তিমিযী)

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ ﴾ يونس: ١٠٦

আল্লাহ ছাড়া এমন কারো নিকট দু'আ করনা যারা না পারে তোমার উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে। আর যদি উহা কর তবে অবশ্যই তুমি জালিমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস ১০৬)
আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ ﴾ الزمر: ٦٥

তুমি যদি কোন শিরক কর তবে তোমার সৎ কর্ম বাতিল হয়ে যাবে আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার ৬৫)
প্রশ্নঃ নিয়ত বলতে কি বুঝায়?
উত্তরঃ নিয়ত হচ্ছে উদ্দেশ্য বা সংকল্প। আর এর স্থান হচ্ছে অন্তর। মুখে উহা উচ্চারণ করা জায়েয নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণ কখনও উহা জবানে বলেননি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣ ﴾ الملك: ١٣

আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ্যেই বল না কেন, তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই অন্তরের কথাও জ্ঞাত আছেন। (সূরা মুলক ১৩)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى (متفق عليه)

নিশ্চয় সমস্ত 'আমলই নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর প্রতিটি ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
এই হাদিসের অর্থঃ 'আমল সহীহ হওয়ার অথবা কবুল হওয়া কিংবা পূর্ণতা লাভ করার জন্য নিয়ত হল শর্ত। (ইমাম নববী রহ. এর 'হাদিসে আরবাইন দেখুন)
প্রশ্নঃ কিছু লোক বলেঃ "দ্বীন হচ্ছে অন্তরের বস্তু" —এ কথার অর্থ কি?
উত্তরঃ এ ধরণের কথা ঐ সমস্ত লোকেরাই বলে থাকে যারা শরিয়তের দায়িত্ব (হুকুম আহকাম) হতে মুক্ত হয়ে দূরে পালিয়ে বাঁচতে চায়। দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে আক্বীদা, ইবাদত, মুয়ামালাতসহ সব কিছু।

১। আক্বায়েদঃ অন্তরে ঈমানের রোকনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। ইহার বিশ্লেষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ

الايمان ان تؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره (رواه مسلم)

ঈমান হচ্ছে আল্লাহর উপর, তার মালাইকাদের (ফিরেশতার) উপর, তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর, রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর, এবং তকদিরের ভালমন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (বর্ণনায় মুসলিম)

২। ইবাদতঃ উহা হবে অংঙ্গ প্রতঙ্গের দ্বারা। তবে নিয়ত থাকবে অন্তরে, যেমন ইসলামের রোকন সমূহ। এ সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (ইসলামের ভিত্তি পাচটিঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ছাড়া অন্যদের সাথে কুফরী করা, সালাতকে উহার যথা নিয়মে আদায় করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরে হজ করা এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করা। (বর্ণনায় মুসলিম)

এই সমস্ত রোকন (ভিত্তি) সমূহকে পালন করতে হবে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে।

ওমর (রাঃ) এর মতো আমরাও বলতে চাই যে, আমরা যে কোন মুসলিমের ব্যাপারে রায় দেব তার বাহ্যিক কর্ম দেখে। আর অন্তরে কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যদি ঐ ব্যক্তির অন্তর শুদ্ধ হতো তবে তা তার শারিরীক আমল যথাঃ সালাত, যাকাত ও অন্যান্য ফরয ইবাদতের মাধ্যমে প্রকাশ পেতো এবং হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য মুশরিক জাতি হতে পৃথক-মুসলিম জাতির প্রতীক তার মুখমন্ডল ও শরীরে প্রকাশ পেত। এদের দিকেই ইঙ্গিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেনঃ ওহে, নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এমন একটি অঙ্গ আছে, যদি উহা সহীহ শুদ্ধ হয় তবে সমস্ত শরীরই শুদ্ধ হবে, আর যদি উহা নষ্ট হয়ে যায় তবে সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যাবে আর উহা হচ্ছে ক্বলব বা দিল। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

হাসান বসরী রহ. বলেনঃ ঈমান কেবল অন্তরের আশা কিংবা বাহ্যিক পরিচ্ছদ প্রদর্শনীর নাম নয় বরং ঈমান হচ্ছে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। আর উহার সত্যতার প্রতিফলন ঘটে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। (বর্ণনায় বুখারী)

ইমাম শায়েয়ী রহ. বলেনঃ ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ। যা বৃদ্ধি পায় ও কমে যায়।

সালাফে সালেহীনরা বলেনঃ ঈমান হচ্ছে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ করা এবং অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা আমল করা। (ফত হুল বারী ১/৪৬)

ইমাম বুখারী (রঃ) (১৯৪-২৫৬ হিঃ) বলেনঃ ঈমানদারদের সম্মানের তারতম্য ঘটে ‘আমলের কারণে। (বর্ণনায় বুখারী ১/১১)

প্রশ্নঃ তাওবা কবুল হওয়ার শর্তসমূহ কি কি?

উত্তরঃ তাওবা কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১। ইখলাসঃ গুনাহগার ব্যক্তি তাওবা করবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কাছে, অন্য কারো উদ্দেশ্যে নয়।

২। অনুশোচনাঃ যে সমস্ত পাপ কাজ করেছে তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

৩। পাপ কাজ হতে বিরত থাকাঃ যে গোনাহ তার দ্বারা সংগঠিত হয়েছে ঐ কাজ সে পুরোপুরি ভাবে ত্যাগ করবে।

৪। পাপের কার্যে প্রত্যাবর্তন না করাঃ একজন মুসলিমের মনে এতখানি দৃঢ়তা আনতে হবে যাতে সে আর উক্ত কাজ পূনর্বার না করে।

৫। ইস্তেগফারঃ আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে সে যে অন্যায় করছে, সে জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

৬। হক বা অধিকারসমূহ আদায় করাঃ সে লোকদের যে হক নষ্ট করেছে ঐ হক প্রাপ্য লোকদের কাছে ফিরিয়ে দিবে অথবা ঐ সব হক তাদের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিবে।

৭। তাওবা কবুলের সময়ঃ গুনাহগার তাওবা করবে তার জীবদ্দশায়। মৃত্যু হাজির হওয়ার পূর্বে তওবা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر(رواه الترمذي)

নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার তাওবা কবুল করেন তার মৃত্যুর কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (বর্ণনায় তিরমিযি)

ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

প্রশ্নঃ ইসলামে শত্রুতা এবং বন্ধুত্ব-এর তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ বন্ধুত্ব হচ্ছে আল্লাহ, তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও মুমিন একত্ববাদীদের ভালবাসা এবং তাদের সাহায্য করা। আর শত্রুতা হচ্ছে আল্লাহ, তার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম ও একত্ববাদী মুমিনদের সাথে যে সমস্ত কাফির, মুশরিক, বিদ’আতী, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট রোগমুক্তি, রিযিক, হিদায়েত চায়, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে।

আমাদের উপর ওয়াজিব হল ঐ সমস্ত একত্ববাদী মুমিনদের ভালবাসা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং সাহায্য করা, যারা কোন ধরণের কুফরি করেন না।
আর অন্য দিকে যারা এর উল্টা চলে, তাদের ব্যাপারে আমাদের উপর ওয়াজিব হল তাদের সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা। তাদের বিরুদ্ধে কথার দ্বারা ও অন্তরের দ্বারা যথাসাধ্য জিহাদ করতে হবে।
বিশেষ করে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।
১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (سورة التوبة : ٧١)

মুমিন পুরুষ ও মহিলাগণ একে অপরের বন্ধু। (সূরা তাওবা ৭১)
২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله

ঈমানের সর্বোত্তম হাতল হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রু তা পোষণ করা । (হাসান)
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان (رواه أبوداود)

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং তার কারণেই শত্রু তা পোষণ করে, আল্লাহর জন্যই দান করে কিংবা তার খুশির জন্যই দান করা হতে বিরত থাকে, সে যেন তার ঈমানকে পূর্ণ করল । (বর্ণনায় আবু দাউদ)
৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতদের খোশ খবর জানিয়ে বলেছেনঃ নশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবীও নয়, আর শহীদও নয়। কিন্তু কিয়ামত দিবসে নবী ও শহীদগণ তাদের সাথে গিবতা (ঈর্ষা) করবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উচু মর্যাদা লাভ করার কারণে। সাহাবাগণ (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? উত্তরে তিনি বল্লেনঃ তারা হচ্ছেন ঐ সকল ব্যক্তি যারা অনাত্মীয় হওয়া সত্বেও একে অপরকে ভালবাসে আল্লাহর কিতাবের কারণে। কোন রকম আর্থিক লেনদেনের কারণে একে অপরকে ভালবসে না। আল্লাহর কসম ! অবশ্যই তাদের মুখমন্ডল দীপ্ত

জ্যোতির্ময় হবে এবং তারা নূরের উপর অবস্থান করবে। যখন কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থায় লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হবে তখনও তারা ভীত হবে না। আর লোকেরা যখন পেরেশান হবে তখন তারা পেরেশান হবেনা। তারপর এই আয়াত পাঠ করেনঃ

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢﴾ يونس: ٦٢

ওহে, নিশ্চয় আল্লাহর অলিগণের কোন ভয় নেই ভীতও আর তারা দু:খিত হবে না। (সূরা ইউনুস৬২)

অত্র হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং জামেউল উসুলের টিকায় উহার সনদকে হাসান বলেছেন।

৫। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কারণে ভালবাসে এবং আল্লাহর কারণেই বিদ্বেষ পোষণ করে, আর আল্লাহর কারণেই বন্ধুত্ব করে এবং তার কারণেই শত্রুতা পোষণ করে, সে তার এই 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকর্ট প্রাপ্ত হয়। বান্দা যতই সালাত, সিয়াম আদায়কারী হোক না কেন, কখনো ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। দেখা যায়, বেশীর ভাগ ভ্রাতৃত্বই চালু থাকে দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য। কিন্তু তা তাদের আখিরাতে কোনই উপকার করবে না।

৬। ঐ সব একত্ববাদী মুমিনদের ভালবাসতে চেষ্টা করুন, যারা সর্ব কাজে একমাত্র আল্লাহর সাহয্য কামনা করে। যদিও লোকেরা তাদেরকে নানা ধরনের অপ্রিয় উপাধিতে ভুষিত করে থাকে। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে তাদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখুন। আর যে সব লোক আল্লাহ তাআলা যে আরশের উপর আছেন একথা অস্বীকার করে তাদের কথা শুনা হতে দূরে থাকুন। কারণ তারা বিদ'আতী।

আল্লাহর অলি ও শয়তানের অলি

প্রশ্নঃ কারা আল্লাহ তাআলার অলি?

উত্তরঃ তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত মুমিন মুত্তাকীগণ যারা সর্বাসস্থাতেই আল্লাহকে ভয় করে এবং (আক্বীদা'আমলে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে আকড়ে ধরে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ يونس: ٦٢ - ٦٣

ওহে, নিশ্চয় আল্লাহর অলিগণের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিত হবে না। (সূরা ইউনুস ৬২-৬৩)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إنما ولي الله وصالح المؤمنين (متفق عليه)

নিশ্চয় আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ এবং সৎ কাজ সম্পাদনকারী মুমিনগণ। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
প্রশ্নঃ শয়তানের অলি কারা?
উত্তরঃ তারা হচ্ছে আল্লাহর বিরোধিতাকারীরা তারা কুরআন ও সুন্নাহরর অনুসরণ করা জরুরী মনে করে না এবং বিদ'আত ও নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে।
আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করে। আল্লাহ যে আরশের উপর আছেন তা অস্বীকার করে। তারা যাদু দ্বারা নিজেদের শরীরে লোহা প্রবেশ করায়, তারা যাদুর মাধ্যমে আগুন গলঃধরন করে ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য অগ্নি উপাসক এবং শয়তানদের কার্যসমূহও তারা করে থাকে।
আল্লহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾ الزخرف: ٣٦ - ٣٧

আর যারা আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল, তাদের জন্য আমি শয়তানকে নির্দিষ্ট করে দেই যেন সর্বাবস্থায় সে তাদের সাথী হয়ে যায়। আর নিশ্চয় তারা তাদেরকে সঠিক রাস্তা হতে দূরে সরিয়ে দেয়। যদিও তারা ধারণা পোষণ করে, যে তারা হিদায়েতের উপর আছে। (সূরা যুখরুফ ৩৬-৩৭)
প্রশ্নঃ হক ও বাতিলের মাঝে কি এমন কোন মধ্যম পথ আছে যাকে মানুষ গ্রহণ করতে পারে ?
উত্তরঃ না, মধ্যম পথ বলতে কোন পথ নেই যাকে মানুষ গ্রহণ করতে পারে। কারণ আল্লাহ তাআলা বাতিল ও গোমরাহীকেও ঐ ভাবেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তাই হকের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন (দ্বিতীয়) উত্তম ও সঠিক রাস্তা নেই।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ﴿٣٢﴾ ﴾ يونس: ٣٢

হকের পর গোমরাহী ছাড়া আর কি আছে? (সূরা ইউনুস ৩২)

বড় শিরক ও তার শ্রেণী বিভাগ

প্রশ্নঃ বড় শিরক কি?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে, যে কোন ধরনের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহর জন্যে নিবেদন করা। যেমনঃ দু'আ, যবেহ, রোগমুক্তি, বিপদাপদ থেকে রক্ষা, নজর নেওয়াজ, মানত ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাবধান করে বলেনঃ

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ ﴾ يونس: ١٠٦

আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন কারো নিকট দু'আ কর না, যারা না পারে তোমাদের উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি এরূপ কর তবে নিশ্চয় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস ১০৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور (رواه مسلم)

সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম গুনাহ কি?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে বড় শিরক। উহার দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ

يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾ لقمان: ١٣

হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শিরক কর না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। (সূরা লুক্বমান ১২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলঃ সর্ব নিকৃষ্ট গুনাহ কি? উত্তরে তিনি বলেনঃ

أن تجعل لله ندا وهو خلقك (متفق عليه)

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক বানানো, অথচ একমাত্র আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (বর্ণায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ বর্তমান উম্মতের মধ্যে কি কোন শিরক বিদ্যমান আছে?

উত্তরঃ হ্যাঁ আছে। এর দলিল হল আল্লাহ তাআলার উক্তিঃ

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ ﴾ يوسف: ١٠٦

আর তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি। (সূরা ইউসুফ ১০৬)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان

কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে না যাবে এবং পূজা না করবে। (বর্ণনায় তিরমিযী)

প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের (গাইরুল্লাহ) নিকট দু'আ চাওয়ার হুকুম কি?

উত্তরঃ তাদের কাছে দু'আ চাওয়াটা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যার কারণে মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴿١٤﴾ ﴾ فاطر: ١٤

যদি তাদের নিকট দু'আও কর তবে তা তারা শুনতে পায় না। আর যদি শুনতেও পেত তবে তোমাদের কোন জবাব দিতনা। আর কিয়ামতের দিন তোমারা যে তাদের সাথে শিরক করেছ তা তারা অস্বীকার করবে। (সূরা ফাতির ১৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار (رواه البخاري)

কোন ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করত, তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বর্ণনায় বুখারী)

প্রশ্নঃ দু'আ কি ইবাদত?

উত্তরঃ হ্যা, দু'আ হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾ غافر: ٦٠

তোমাদের রব (প্রতিপালক) বলেনঃ আমার নিকট দু'আ কর, আমি উহা কবুল

করব। আর যারা অহংকার করে আমার ইবাদতে (দুআ করার ব্যাপারে) তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফির ৬০)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দুআই ইবাদত। (বর্ণনায় তিরমিযি)
প্রশ্নঃ মৃতরা কি দুআ শুনতে পায়?
উত্তরঃ না, তারা দুআ শুনতে পায় না।
১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ﴿٢٢﴾ فاطر: ٢٢

আর আপনি কখনও ঐ ব্যক্তিকে কিছু শুনাতে পারবেন না যে কবরে আছে।
(সূরা ফাতির ২২)
২। তিনি আরও বলেনঃ

﴿ ۞ إِنَّمَا يَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسۡمَعُونَۘ وَٱلۡمَوۡتَىٰ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ الأنعام: ٣٦

একমাত্র তারাই উত্তর দিতে পারে যারা শুনতে পায়। মৃতদের আল্লাহ তাআলা পূণর্জীবিত করবেন। তারপর তারা তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা আন’আম ৩৬)
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের প্রতি ইশারা করেছেন। কারণ তাদের অন্তর মৃত। তাই তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মৃতদের সাথে তুলনা করেছেন। (বর্ণনায় ইবনে কাসির (রঃ))
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغون عن امتي السلام (رواه الحاكم)

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার এমন একদল মালাইকা (ফিরিশ্তা) আছেন যারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ান। তারা উম্মতের পক্ষ হতে তাদের সালাম (দরুদ) আমার নিকট পৌছান। (বর্ণনায় হাকেম)
যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের সালাম নিজে নিজে শুনতে না পান, মালাইকাদের পৌছে দেয়া ব্যতীত, তাহলে অন্যদেরতো তা শুনার প্রশ্নই উঠে না।
৪। ইবনে ওমর (রঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিবসে কাফির মুশরিকদের লাশ যে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই “কুলাইব”

নামক স্থানে দাড়িয়ে বলেনঃ তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা এখন বুঝতে পারছ? তারপর বললেন, নিশ্চয় তারা আমি যা বলছি তা শুনতে পাচ্ছে। উম্মল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) এর নিকট এ হাদীস উল্লেখ করে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উক্তি দ্বারা এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা অবশ্যই একথা জানতে পারছে যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٨٠﴾ ﴾ النمل: ٨٠

নিশ্চয় আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না। (সূরা নামল,৮০)

কাতাদাহ (রাঃ) এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেনঃ

أحياهم الله حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة (رواه البخاري)

আল্লাহ তাআলা উক্ত কাফিরদের কিছু সময়ের জন্য জীবিত করেছিলেন তাদের কৃতকর্মের প্রতি ভৎর্সনা ও হেয় করার জন্য। আর পাপের শাস্তি, আফসোস, অনুশোচনা এবং লজ্জিত হওয়ার জন্য। (বর্ণনায় বুখারী)

এই হাদিস হতে শিক্ষনীয় বিষয়

১। মৃত মুশরিকরা যে কথা শুনতে পেয়েছিল তা ছিল নির্ধারিত স্বল্প সময়ের জন্য। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন্তব্যঃ নিশ্চয় তারা এখন আমার কথা শুনতে পাচ্ছে। এ থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা আর শুনতে পাবে না। ঐ হাদিস বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তাদের এ জন্য জীবিত করেছিলেন যাতে তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে পায় এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপের শাস্তির কারণে আফসোস ও অনুশোচনা করে।

২।আয়েশা রা. ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতকে অস্বীকার করে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেননি যে, তারা শুনতে পাচ্ছে বরং বলেছেন, জানতে পারছে। এর স্বপক্ষে দলিল স্বরূপ তিনি আল্লাহপাকের ঐ কথা বলেনঃ

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى

নিশ্চয়ই আপনি মৃতদের কথা শুনাতে পারেন না। (সূরা নামল, ৮০)

৩।ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) এর দুই রেওয়ায়েতের সমন্বয় নিম্ন উপায়ে

করা যেতে পারেঃ মূল কথা হল, মৃতরা কথা শুনতে পায় না। যা ক্বুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্ত আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযা স্বরূপ মুশরিকদের জীবিত করেছিলেন, যাতে তারা শুনতে পায়। হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) স্পষ্টভাবে ঐ মন্তব্যই করেছেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত আছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাহাবীদের অনুভূতি-কে স্বীকৃতি দান

কুলাইবের উপরোক্ত হাদীস হতে এটাই বুঝা গেল যে, মৃতরা শুনতে পায় না। উহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় সাহবীদের মতামত থেকেও। তাদের প্রথম সারিতে আছেন ওমর (রাঃ) এর মত সাহবী। তিনি বলেনঃ যে দেহের মধ্যে আত্মা নেই সে কথা শুনতে পায় না। এই আক্বীদা যে তাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গাথা ছিল তা উক্ত বক্তব্যেই প্রতীয়মান হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাদের কথা স্বীকার করেছিলেন তা উহাকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। কিন্তু উক্ত ঘটনা, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, উহা শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে নিহত কুলাইব কূপের মুশরিকদের বেলায় প্রযোজ্য।

ইমাম আহম্মদ (রঃ) যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তাতে একথা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছেঃ "ওমর (রাঃ) তার কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাদের তিনবারের পরেও ডাকবেন? আর তারা কি শুনতে পাচ্ছে? কারণ, আল্লাহ তালা বলেনঃ (নিশ্চয় আপনি মৃতদের কথা শুনাতে পারেন না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ঐ আল্লাহর কসম যার হতে আমার জীবন! তারা আমার কথা তোমাদের থেকে কম শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু তারা কোন জবাব দিতে পারছেনা। "(বর্ণনায় আহম্মদ)

এ কথার দলিল স্বরূপ ওমর (রাঃ) ক্বুরআনের আয়াত পেশ করেন। যদি এই কথাকে তিনি বুঝতে না পারতেন তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তাকে অস্বীকার করতেন। আর বলতেন, যে এই আয়াত দ্বারা এটা বুঝাচ্ছে না যে, মৃতরা কখনও শুনতে পায় না। যেহেতু তিনি উহা অস্বীকার করেননি, ফলে তাতে বুঝা যায় যে, ওমর (রাঃ) যা বলেছেন তা সত্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

বড় শিরকের শ্রেণী বিভাগ

প্রশ্নঃ আমরা কি মৃত অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট বিপদে উদ্ধার প্রার্থনা করব?

উত্তরঃ না, কখনো নয়। বরং সর্বাবস্থাতেই আমরা। চিরঞ্জীব আল্লাহর নিকট সাহায্য

প্রার্থনা করব।

১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٢١ ﴾ النحل: ٢٠ - ٢١

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দুআ করে, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা মৃত, জীবিত নয়। আর তাদের একথাও জানা নেই যে, কখন তাদের পূনর্জীবিত করা হবে। (সূরা নাহাল ২০-২১)

২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿ إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ ﴾ الأنفال: ٩

আর যখন (বদরের প্রান্তে তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্য চেয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের দুআ কবুল করেন। (সূরা আনফাল ৯)

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث (رواه الترمذي)

হে চিরজীব ! চিরস্থায়ী, আমরা একমাত্র আপনার রহমতের উসিলায় সাহায্য ভিক্ষা চাচ্ছি। (বর্ণনায় তিরমিযি হাসান)

প্রশ্নঃ আমরা কি জীবিতদের নিকট বিপদাপদে সাহায্য ভিক্ষা করব?

উত্তরঃ হ্যাঁ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে তারা সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে কেবল মাত্র সে সব ক্ষেত্রে তাদের নিকট সাহায্য চাবো। যেমন আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ) সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيۡهِۖ ١٥ ﴾ القصص: ١٥

ঐ ব্যক্তি, যিনি তার (মুসার) দলের ছিল। সে তার নিকট সাহায্য চাইল তার শত্রুর বিরুদ্ধে। তখন মূসা তাকে এমন এক ঘুষি মারল যার কারণে তার মৃত্যু হয়। (সূরা ক্বাসাস ১৫)

প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কি বৈধ (জায়েয)?

উত্তরঃ ঐ সমস্ত কাজ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয় তাতে সাহায্য চাওয়া জায়েয নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (سورة الفاتحة : ٥

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। (সূরা ফাতিহা ৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله (رواه الترمذي)

যখন প্রার্থনা কর তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটই কর। আর যখন সাহায্য চাও তখন একমাত্র তারই নিকট সাহায্য চাও। (বর্ণনায় তিরমিযী হাসান সহীহ)

প্রশ্নঃ আমরা জীবিতদের নিকট কোন ধরণের সাহায্য ভিক্ষা করব?

উত্তরঃ যে সমস্ত কাজে জীবিত ব্যক্তি সাহায্য করতে সমর্থ যেমনঃ কর্জ দেয়া, আর্থিক বা দৈহিকভাবে সাহায্য করা ইত্যদি।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴿٢﴾ ﴾ المائدة: ٢

এবং তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর উত্তম কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে। (সূরা মায়িদা ২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون اخيه (رواه مسلم)

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইকে সাহায্য করে। (বর্ণনায় মুসলিম)

আর রোগ মুক্তি, রিযিক, হিদায়েত এবং এই জাতীয় জিনিসগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চাওয়া যাবে না। জীবিত ব্যাক্তিরা এই জাতীয় কার্য করতে যেমন সামর্থ রাখে না তেমনি মৃত্যুদেরতো তা করার প্রশ্নই আসে না।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ ﴾ الشعراء: ٧٨ - ٨٠

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে হিদায়েত দান করেন। তিনি আমাকে খাওয়ান এবং পান করান। আর যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করেন। (সূরা শুআরা ৭৮-৮০)

প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নযর (মানত) দেয়া জায়েয আছ কি?
উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মানত দেয়া আদৌ জায়েয নেই বরং ইহা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা এমরান বিবির জবানীতে বলেনঃ

﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴿٣٥﴾ ﴾ آل عمران: ٣٥

হে আমার রব, আমার পেটে যে সন্তান আছে তা আমি তোমার নামে মানত করে মুক্ত করে দিলাম। (দ্বীনের কাজে)। (সুরা আল ইমরান ৩৫)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذران يعصيه فلايعصيه (رواه البخاري)

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য কোন মানত করে সে যেন অবশ্যই তা পালন করে। আর যে মানত করে আল্লাহর সাথে অবাধ্যতার কোন কাজ, তবে সে যেন তা আদায় না করে। (বর্ণনায় বুখারী)
প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জায়েয আছে কি?
উত্তরঃ না জায়েয নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾ الكوثر: ٢

তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং যবেহ কর। (সূরা কাওসার ২)
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। (বর্ণনায় মুসলিম)
এ জন্য কবর, মাজার, দরগাহ জাতীয় কোন জায়গা অথবা দর্শনীয় কোন বস্তুর নিকট যবেহ করা জায়েয নয়, যদিও তা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। উহা মুশরিকদের কাজ।
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من تشبه بقوم فهو منهم (رواه أبو داود)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। (বর্ণনায় আবুদাউদ)
প্রশ্নঃ আমরা কি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার জন্য কবরের চারিদিকে তাওয়াফ করব?

উত্তরঃ না, আল্লাহর ঘর কাবা ব্যতীত অন্য কোন স্থানের চারিদিকে তাওয়াফ করব না। কারণ উহা আল্লাহর হুকুম। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ الحج: ٢٩

এবং তারা যেন আল্লাহর ঘরে (চতুর্দিকে) তাওয়াফ করে। (সূরা হজ ২৯)
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة (رواه ابن ماجه)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ করে এবং তাওয়াফ শেষে দুই রাকাআত সালাত আদায় করে সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল। (ইবনে মাজাহ, ছহীহ)
প্রশ্নঃ যাদুর হুকুম কি?
উত্তরঃ যাদু কবিরা গুনাহের অন্তর্ভক্ত। অনেক ক্ষেত্রে উহা কুফরী পর্যায়েও চলে যায়।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ ١٠٢﴾ البقرة: ١٠٢

কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করেছিলো এবং মানুষদের যাদু শিক্ষা দিত।
(সূরা বাক্বারাহ,১০২)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

اجتنبوا السبع الموبقات :الشرك بالله والسحر (رواه مسلم)

তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ হতে নিজেদেরকে বিরত রাখ- আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু ... (বর্ণনায় মুসলিম)
কখনো কখনো যাদুর কারণে মুশরিক কিংবা কাফির হয়ে যায় অথবা ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়। তখন আমাদের উপর ওয়াজিব হল তার বিচার করে হত্যা করা। তার যাদুর কর্ম তৎপরতা মোতাবেক শাস্তি দেয়া যাবে। কারণ যাদুকর যাদুর মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, অথবা কারও জীবন নাশ করতে চায়। বিংবা কারও বুদ্ধি ভ্রান্ত করে পাগল বানাতে চায়। এ কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।
প্রশ্নঃ আমরা জ্যোতিষী ও ভবিষ্যৎ বক্তাদের (গণক, হস্তরেখাবিদ) কথাকে বিশ্বাস করব?

উত্তরঃ না, কখনো নয়। আমরা তাদের কথাকে আদৌ বিশ্বাস করব না। গায়েবী সংবাদ যেন কেউ বিশ্বাস না করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা তার কোরআনে বলেনঃ

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ﴿٦٥﴾ ﴾ النمل: ٦٥

আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীতে গায়েবী খবর আসমান ও যমীনের কেউ জান না। (সূরা নামাল ৬৫)

ঐ ধরণের কথা বিশ্বাস করা নিজেদের উপর কত বড় জুলুম তারই প্রতি ঈঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

(رواه احمد)

যে ব্যক্তি জ্যোতিষী (গণক) অথবা জ্বিন পূজারীদের কাছে যাতায়াত করে এবং তারা যা বলে উহা বিশ্বাস করে নিশ্চয় সে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করল। (বর্ণনায় আহমদ)

প্রশ্নঃ গায়েবের খবর কেউ জানে কি?

উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া কারো গায়েবের খবর জানা নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ ﴿٥٩﴾ ﴾ الأنعام: ٥٩

আল্লহর নিকট গায়েবের চাবিসমূহ রয়েছে, উহা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (সূরা আনআম ৫৭)

প্রশ্নঃ ইসলাম পরিপন্থী আইন মোতাবেক বিচারকারীর হুকুম কি?

উত্তরঃ যে বা যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার-ফয়সালা করা বর্তমান সময়োপযোগী না হওয়ার আক্বীদা পোষণ করে অথবা ইসলামী আইনকে অনুপযুক্ত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা যেন কুফরী করল এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ المائدة: ٤٤

আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন ঐ মোতাবেক যারা বিচার করে না তারা কাফির (সূরা মায়িদাহ ৪৪)

আল্লাহর আইনের অবাধ্যকারীদের পরবর্তী পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে নবী

সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم

আর যখন তাদের নেতা ও প্রধানরা আল্লাহর আইন মুতাবেক বিচার করে না অথবা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন উহার কিছু গ্রহণ করবে এবং কিছু ছেড়ে দেবে তখনই তাদের মধ্যে আপোষের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেবেন। (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ্)

প্রশ্নঃ ইলহাদ কি এবং ইলহাদের ব্যাপারে ইসলামের মতামত কি?

উত্তরঃ ইলহাদ, যানদাকার মানে হচ্ছে ধর্মদ্রোহীতা। তা হল, আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ, নীতি ও আদর্শ বর্জন করে বিভ্রান্ত ও মেকী আদর্শের প্রতি ঝুকেঁ যাওয়া এবং নানা অজুহাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উল্টো পথে নিপতিত হওয়া। তাই আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত তাওহীদের পথকে উপেক্ষা করে যারা সন্দেহজনক কথা বলে এবং দ্বীন সম্পর্কে যারা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক। এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে আছে-আল্লাহ্ রাব্বুলআলামীনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অথবা অন্য কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করে তাকে উপাস্য করে কিছু চাওয়া ও সম্মান করা, অথবা ঐ গাইরুল্লাহর পক্ষ হতে আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী রচিত আহবান কিংবা ব্যাখ্যাকে কবুল করা। যে ব্যক্তি তার বিভ্রান্ত শিক্ষা অথবা সীমিত জ্ঞান ও খেয়াল খুশিমতে কোরআন এবং হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ বিকৃত করল সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম ও গুণাবলীর মধ্যে এবং কোরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে সীমা লংঘন করল সেই নাস্তিক। এদের ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ الأعراف: ١٨٠

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। ঐ সমস্ত নামের উসিলায় তার নিকট দু'আ কর। যারা তার নামসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। তাদের ঐ কৃতকর্মের প্রতিফল অতি সত্বরই দেয়া হবে। (সূরা আ'রাফ১৮০)

ইমাম কাতাদাহ্ (রঃ) বলেনঃ "ইলহাদ" অর্থ আল্লাহর সাথে শিরক করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "ইলহাদ" অর্থ মিথ্যা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ ﴿٤٠﴾﴾ فصلت: ٤٠

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে (ইলহাদ) অস্বীকার করে তারা আমার কাছ থেকে গোপন নয়। (সূরা ফুসসিলাত ৪০)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “ইলহাদ” হচ্ছে আল্লাহর বাণীর মর্ম ঘুরিয়ে বলা।

ইমাম কাতাদাহ (রঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বলেনঃ উহার অর্থ হচ্ছে কুফরী করা এবং সঠিক নীতি হতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া। (তাফসীরে ইবনে কাসির)

অনুরূপভাবে, মুলহিদ ঐ ব্যক্তি, যে মনে করে যে, ইসলামী শরীয়া সব ধরণের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয় এবং এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তাদের নিজেদের ভ্রান্ত বিবেক প্রসূত আইন ধারা সমস্যার মোকাবিলা করতে চায়। সে এ ক্ষেত্রে তার বুদ্ধি বিবেককে ইসলামের তথা আল্লাহর আইনের উপরে প্রাধান্য দিল।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইলহাদ বা নাস্তিকতা বিভিন্ন ধরণের, তাদের বিভিন্ন নাস্তিকতা মুলত আমলের কারণে। তারা হল-

১। এক ধরণের নাস্তিক হচ্ছে তারা, যারা জগতের প্রতিপালক এবং ব্যবস্থাপককে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীকেও অস্বীকার করে। এ ধরণের নাস্তিক কাফির।

২। আর এক ধরণের নাস্তিক হল ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ছেড়ে গাইরুল্লাহকে ডাকে, মৃতের নিকট সাহায্য কামনা করে- যা প্রকৃত পক্ষে প্রকাশ্য শিরক এবং ইসলামের অন্যান্য সৎ আমল সমূহকে ধ্বংস করে দেয়। এ ধরণের লোকদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত যদি তারা মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর কাছে তাওবা না করে এবং খাটি দ্বীনের রাস্তায় প্রত্যাবর্তন না করে।

৩। অন্য আর এক শ্রেণীর নাস্তিক হল তারা, যারা আল্লাহর কিতাব এবং সহীহ সুন্নাতে সুসাব্যস্ত থাকা সত্ত্বে ও আল্লাহর নাম ও সিফতকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে থাকে এ ধরণের লোক প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে আছে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সমস্ত ধরণের নাস্তিকতা থেকে রক্ষা করুন।

প্রশ্নঃ আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

উত্তরঃ যদি এধরণের প্রশ্ন মনে উদয় হয় তাহলে মনে করবে, শয়তানের কু-প্ররোচনার কারণে এ প্রশ্ন উদয় হয়েছে। তখন আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম বলবে।

আল্লাহ তাআলা উপদেশ দিয়ে বলেনঃ

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ﴾ فصلت: ٣٦

আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কু-মন্ত্রণা অনুভব করেন,তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হউন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন)। (সূরা ফুসিসলাত,৩৬)
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা শয়তানের কু মতলব মন থেকে দূর করবো। তিনি বলতে বলেছেন-আমানতু বিল্লাহি ওয়া রুসুলিহি, আল্লাহু আহাদ, আল্লাহু সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ, ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। তারপর বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবো এবং আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতা নির রাজীম বলব এবং ঐ রূপ কু-ধারণা থেকে বিরত থাকব। এভাবে মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
আবু দাউদ, আহমাদে বর্ণিত সহীহ হাদীসের সংক্ষেপ সার হল এই যে, ঐ সাথে এ কথাও বলা প্রয়োজন- আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, সব কিছুর স্রষ্টা-আল্লাহু খালেকুন।
তিনি এক, তার পূর্বে কোন কিছুই নেই।
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

اللّٰهُمَّ انت الاول فلا شئ قبلك : (رواه مسلم)

হে আল্লাহ্! আপনি প্রথম। আপনার পূর্বে কোন কিছু ছিল না। (বর্ণনায় মুসলিম)
প্রশ্নঃ ইসলাম পূর্ব যুগে মুশরিকদের আক্বীদা কি ছিল?
উত্তরঃ জাহেলীয়াত যুগে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য তারা তাদের মনোনীত অলিদের (তাদের ধারণায়) নিকট প্রর্থনা করত। আল্লাহর কিতাবের অনুসারী না হয়ে বরং নিছক নিজেদের খেয়াল খুশি মত তারা বিভিন্ন জিনিসের পূজা করত আর বলত যে, এরাই আল্লাহর তরফ থেকে কোন বিপদ এলে তখন সাহায্য করবে।
আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿٢﴾ ﴾ الزمر: ٢

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তাদেরে ইবাদত করি এইজন্য যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (সূরা যুমার ২)
আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا

عِندَ ٱللَّهِۚ ﴿١٨﴾ يونس: ١٨

তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকে যে না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (সুরা ইউনূস ১৮)

বর্তমান যামানায় কিছু কিছু মুসলিম নামধারী মুশরিকদের অনুকরণ করে কবরের কাছে দিয়ে মৃতদের এই উদ্দেশ্যে ডাকে যে, তারা (মৃতরা) তাদের উপকার করবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে, কিংবা যা একমাত্র আল্লাহর অধিকারে যথাঃ রোগ মুক্ত, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার ইত্যাদি, তা তারা দান করবে।

প্রশ্নঃ ভয় কি ? উহার শ্রেণী বিভাগ কি কি?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে হৃদয়ের মধ্যস্থিত এক ধরণের অনুভূতি। উহা দুই শ্রেণীর – (১) আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ ভয় করা। (২) স্বাভাবিক বা বাহ্যিক কারণে ভয়।

প্রথমটাকে বলা যায় আক্বীদাগত বা বিশ্বাসের কারণে ভয়ঃ উহা হল এ ধরণের যে, মৃত ব্যক্তিরা ক্ষতি করবে, বিপদে ফেলবে, জানমালের ক্ষতি করবে এরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে পোষণ করা। ইহা বড় শিরকের পর্যায়ভূক্ত এবং শয়তানের কার্যকলাপ। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ ﴾ آل عمران: ١٧٥

উহা তো একমাত্র শয়তানের কাজ, যে তার বন্ধুদের ভয় প্রদর্শন করে। তাই, তোমরা যদি সত্যিকারভাবে মুমিন হয়ে থাক তাহলে তাদেরকে ভয় করোনা বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা আল-ইমরা ১৭৫)

অর্থাৎ শয়তানের পূজারীরা তোমাদের এ বলে ভয় দেখায় যে, ঐ সব মৃত ব্যক্তিরা বড় ভয়ানক ও শক্ত ক্ষমতার অধিকারী। যখন তোমাদের মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা ধারায় শয়তান এইরূপ কথা সাজাবে এবং কু-ধারণায় নিপতিত করবে তখন তোমরা একমাত্র আমার উপর ভরসা কর এবং আমারই সাহয্য চাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট এবং ঐ সমস্ত শয়তানী দলের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের সাহায্যকারী। (ইবনে কাসির)

মৃতদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা মনে বদ্ধমূল হয় শয়তানের প্ররোচনার কারণে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ ﴾ الزمر: ٣٦

আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে অন্য মা’বুদদের (গাইরুল্লাহ) ভয় দেখায়। (সূরা যুমার ৩৬)
অর্থাৎ মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের ঐ সমস্ত মূর্তি ও দেবতাদের ভয় দেখাতো, যারা ছিল মৃত, আর যাদেরকে তারা অজ্ঞতা ও গোমরাহীর কারণে ডাকতো।
(ইবনে কাসির)
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍۗ ﴾ هود: ٥٤

আমরা তো মনে করি যে, আমাদের মা’বুদগুলোর কেউ তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তাই তুমি আমাদের ধর্মের বিপরীত কথা বলছো। (সূরা হুদ ৫৪)
অর্থাৎ, কাফিররা মনে করত যে, তাদের মাবুদদের অস্বীকার করার কারণে কোন মাবুদ হুদ (আঃ) এর বিবেকের মধ্যে গোলমাল ও পাগল করে দিয়েছে। এর উত্তরে হুদ (আঃ) বলেনঃ

ۚ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ٥٤ مِن دُونِهِۦۖ فَكِيدُونِي جَمِيعٗا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ٥٥ ﴾ هود: ٥٤ - ٥٥

আমি আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও স্বাক্ষী থেক যে, তোমরা যে গাইরুল্লাহর ইবাদত করছ উহা হতে আমি মুক্ত। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে (গাইরুল্লাহসহ) আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক এবং আমাকে কিছুমাত্র অবকাশ দিওনা। (সূরা হুদ ৫৪-৫৫)
লেখক বলেনঃ মৃত ব্যক্তি কোন ক্ষমতার অধিকারী-একথা ধারণা করা বড় শিরক। এর দলিল উপরোক্ত আয়াত। কিছু কিছু মুসলিম শিরকে পতিত হয়েছে মৃতদেরকে ভয় করার কারণে। অথচ ঐ মৃতরা নিজেদের রক্ষা করতেই অক্ষম, তারা আবার অন্যের ক্ষতি করবে এটা তো অবাস্তব ধারণা। মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা এরূপ যে, তাদের অবস্থানের স্থলে যদি আগুন লেগে যায় তবে সেখান থেকে পালাতে ও সক্ষম হবে না, বরং পুড়ে যাবে।

স্বাভাবিক ভয়ঃ স্বাভাবিক ভয় বলতে কোন যালিম অত্যাচারীকে ভয় করা অথবা কোন হিংস্র পশুকে ভয় করা ইত্যাদি বুঝায়। ইহা শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়। আল্লহ্ তালা বলেনঃ

﴿ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ ﴾ طه: ٦٧

(যাদুকরদের যাদু দেখে) মূসা ভয় পেয়ে গেল। (সূরা ত্বাহা ৬৭)

অন্যত্র দেখতে পাই যে, মূসা (আঃ) কে যখন আল্লাহ তাআলা ফিরাউনকে হিদায়েতের জন্য পাঠালেন তখন মূসা (আঃ) বলেনঃ

﴿ وَلَهُمۡ عَلَيَّ ذَنۢبٞ فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ ﴿١٤﴾ ﴾ الشعراء: ١٤

আমার উপর তাদের এক অন্যায় দাবী আছে, যে কারণে আমি ভয় করছি যে, তারা আমায় মেরে ফেলতে পারে। (সূরা শু'আরা ১৪)

প্রশ্নঃ মৃতদের মসজিদে দাফন করার ব্যাপারে হুকুম কি?

উত্তরঃ মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর। সেখানে কাউকে দাফন করা হারাম। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ﴿١٨﴾ ﴾ الجن: ١٨

নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর। তাই সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করো না। (সূরা জিন, ১৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ আমলকারীদের সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেনঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا (متفق عليه)

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক। কারণ, তারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছিল। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ কররের দিকে সালাত আদায় করা জায়েয কি?

উত্তরঃ না, জায়েয নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ ﴿١٤٤﴾ ﴾ البقرة: ١٤٤

আপনি আপনার মুখকে মসাজিদুল হারামের দিকে ফিরান। (সূরা বাক্বারাহ ১৪৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (رواه مسلم)

তোমরা কবরের দিকে সালাত আদায় কর না, আর না তার উপর উপবেশন কর। (বর্ণনায় মুসলিম)

আল্লাহ্ তাআলার সাথে শিরক করা

প্রশ্নঃ আমরা কি ভাবে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা হতে বিরত থাকব?

উত্তরঃ নিম্ম লিখিত আক্বীদা ও বিশ্বাসগুলো যতক্ষণ অন্তরে পোষণ করা হবে ততক্ষণে আল্লাহর সাথে শিরক করা হতে কেউ বিরত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যাবে না।

১। আল্লহ তাআলার কার্যসমূহে শিরক করাঃ কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, জগতে কিছু কুতুব আছে যারা জগতের কোন কোন জিনিসের কার্য-নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক, যদিও কোরআনে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ يونس: ٣١

আসমান ও যমীনের সব কিছু কে নিয়ন্ত্রণ করে? উত্তরে তারা সাথে সাথে বলবে, আল্লহ্। (সূরা ইউনূস : ৩১)

২। ইবাদতে শিরক করাঃ আল্লহকে ছেড়ে নবী কিংবা আউলিয়াদের (তাদের মৃত্যুর পর) নিকট দু’আ করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ ﴾ الجن: ٢٠

হে নবী! বলুন, আমি আমার রবকে ডাকি এবং সাথে অন্য কাউকে শরিক করি না। (সূরা জিন: ২০)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (দু’আ হচ্ছে ইবাদত)। (বর্ণনায় তিরমিযি, হাসান)

৩। আল্লাহর সিফাতের মধ্যে শিরক করাঃ এ ধরণের আক্বীদা বা বিশ্বাস পোষণ কর যে, নিশ্চয় রাসূল ও আউলিয়াগণ গায়েবের খবর জানন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴿٦٥﴾ ﴾ النمل: ٦٥

আপনি বলুন, আসমান ও যমিনে আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে যে গায়বের খবরের জ্ঞান রাখে। (সূরা নামল, ৬৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের খবর জানে না। (বর্ণনায় তাবরানী)

৪। আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোন গুণে অন্যকে সাদৃশ্য করাঃ যেমন এ ধারণা করা যে, কোন আমির বা শাসকের নিকট যেতে হলে যেমন মাধ্যম দরকার তেমনি আল্লাহর

কাছে কিছু বলার জন্যও মাধ্যম দরকার। এ ধারণা আল্লাহর সাথে তার মাখলুকের (সৃষ্টির) সাথে সাদৃশ্য করা হয়। উহা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। কোননা, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ﴿١١﴾ ﴾ الشورى: ١١

তার মত অন্য কিছু নেই। (সূরা শূ'রা, ১১)

প্রশ্নঃ জাহেলিয়া যামানার শিরক কি এখনও বিদ্যমান আছে?

উত্তরঃ জাহেলিয়া যুগে যে শিরক এর প্রচলন ছিল উহা বর্তমান যামানায়ও মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে।

১। পূর্বের যামানার মুশরিকরা যদিও একথা বিশ্বাস করত যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা ও রিজিক দাতা, তা সত্বেও তারা তাদের অলি আউলিয়াদের মূর্তি বানিয়ে, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার মাধ্যম হিসাবে তাদের পূজা করত। আল্লাহ তাদের এই নৈকট্য হাসিল করার 'আমলকে পছন্দ করেননি, বরং তাদেরকে কাফির বলে সম্বোধন করেছেন। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ ﴾ الزمر: ٣

আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে তাদের অলি বানিয়ে বলেঃ আমরা তাদের ইবাদত করি এই জন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তার অবশ্যই বিচার করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের হিদায়েত দান করেন না যারা মিথ্যাবাদী ও কাফির। (সূরা যুমার, ৩)

আল্লাহ তাআলা সকলের প্রার্থনাই সরাসরি শুনেন খুবই নিকট হতে। তার নিকট ফরিয়াদ পৌছাতে কোন সৃষ্টিকে অসিলা (মাধ্যম) হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আল্লহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ ﴿١٨٦﴾ ﴾ البقرة: ١٨٦

আর যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে আছি। (সূরা বাক্বারাহ, ১৮৬)

দেখা যায়, বর্তমান যামানায় বহু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি আল্লাহর অলিদের কবরের কাছে গিয়ে তাদের ডাকে। যাতে তারা (অলি) ঐ সব লোকদের আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে দেয়। ঐ যামানায় মুশরিকদের অলিরা মূর্তির আকারে ছিল আর বর্তমান যামানার অলিদের কবর সমূহকে মুসলিম নামধারীরা ঐ ভাবেই ভক্তি করে। তবে এটা জেনে রাখা দরকার যে, কবরের ফিৎনা মূর্তি পূজার ফিৎনা হতে অনেক বেশী মারাত্মক ফিৎনা।

২। আগের যামানায় মুশরিকরা যখন বিপদে পড়ত তখন একমাত্র আল্লাহকে ডাকত, আর সুসময়ে আল্লাহর সাথে শিরক করত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ العنكبوت: ٦٥

অতঃপর তারা যখন নৌকায় আরোহন করত তখন, (বিপদে পড়লে) ইখলাসের সাথে আল্লাহকে ডাকত, আর যখন তিনি তাদের নিরাপদে কিনারে পৌঁছিয়ে দিতেন তখন তারা তাঁরা সাথে শিরক করত। (সূরা 'আনকাবুত ৬৫)

মুশরিকরা শুধুমাত্র, যখন বিপদে পড়ে তখন একমাত্র আল্লাহকেই ইখলাসের সাথে ডাকত, সে ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখুন, আজকালকার ইসলামের দাবীদারদের জন্য এটা কিভাবে জায়েয হবে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় গাইরুল্লাহকে ডাকে।

ইসলামের একদল দাবীদাররা মনে করে যে, অলি আউলিয়াদের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আছে। তারা পূর্ব যুগের মুশরিক অপেক্ষা ও অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। কেননা, ঐ যুগের মুশরিকরা বিপদকালে তাদের সমস্ত মা'বুদদের পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকত। আর বর্তমান যামানার মুসলিম দাবীদাররা বিপদকালেও খাজা বাবা, মাইজভান্ডারী, আজানগাসী ইত্যাদি মৃত মানুষগুলোর কাছে অথবা কেউ কেউ কল্পনায় খোয়াজ খিজিরকে ডাকে। এদের শিরক এত জঘন্য এবং ঘোর অন্ধকারপূর্ণ যে, কোন সময়ই তারা তাওহীদের আশ্রয় নেয় না। (অনুবাদক)

বড় শিরকের ক্ষতিকর দিকসমূহ

প্রশ্নঃ বড় শিরকের ক্ষতিকর দিক কি?

উত্তরঃ মানুষের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবার প্রধান কারণ বড় শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ المائدة: ٧٢

আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর ঐ সমস্ত যালিমদের (মুশরিক) কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়েদাহ : ৭২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من مات يشرك بالله شيئا دخل النار (رواه مسلم)

আর যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মারা গেল, সে হবে জাহান্নামী। (বর্ণনায় মসলিম)

প্রশ্নঃ শিরকের পাশাপাশি কোন ভাল আমল করলে তা তাকে উপকার দেবে কি?

উত্তরঃ না, শিরকের সাথে কোন ভাল 'আমল করলেও তা ঐ 'আমলকারীর কোন উপকারে আসবে না।

কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨ ﴾ الأنعام: ٨٨

আর যদি তারা শিরক করে, তবে তারা যে 'আমল সমূহ করেছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম ৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته و شركه (حديث قدسي، رواه مسلم)

আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা শিরক করে, আমি তাদের থেকে বিমূখ। আর যে ব্যক্তি এমন আমল করে যাতে সে অন্যকে অংশী করল, তাহলে তাকে এবং তার শিরকি আমল উভয়কে আমি পরিত্যাগ করি। (বর্ণনায় মুসলিম- হাদীসে কুদসী)

সর্বত্র প্রচারিত ক্ষতিকর চিন্তাসমূহ

প্রশ্নঃ জাতির ফয়সালা জাতীয় ভাবধারার মাধ্যমেই হবে আর দেশের সমস্ত সম্পদ দেশের মানুষেরই প্রাপ্য — এ ব্যাপারে মন্তব্য কি?

উত্তরঃ ইহা একটি তথাকথিত গোষ্ঠীর বানানো নীতিকথা। এই জাতীয় কথা ঐ সমস্ত

মিথ্যাবাদীরা বানিয়ে থাকে যারা উহা নিজদের জীবনেই প্রতিফলন ঘটায় না। ফলে জাতিকে তারা অধঃপতনে ঠেলে দেয়। কিন্তু তারা তাদের নীতির কোনটাকেই পরিত্যাগ করে না। বরং রাষ্ট্রই সম্পদের মালিক, ব্যক্তি মালিকানা বলে কিছু নেই, ইত্যদি মিথ্যা বুলি দ্বারা জনগণকে ধোকা দিয়ে থাকে। ওটাতো পথহারা হতভাগ্যদের কথা। ন্যায় ও সত্য কথা এই যে, মানুষ তার জ্ঞান ও সার্মথ্য অনুযায়ী তার মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করবে।

সত্যিকার অর্থে মানব জাতি নিশ্চয় তখন সম্মান ও গৌরবজনক অবস্থা লাভ করবে, যখন তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতা বিরাজ করবে। তখন আর তাদেরকে পশুর ন্যায় হাকিয়ে বেড়াতে হবে না। মানুষের পূর্ণ মর্যদা, ন্যায়, সদাচার নীতি সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ঐ ধরনের বুলি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষমতা ও সম্পদের মূল মালিক মহান রাব্বুল আলামীন। হুকুম দেয়ার মালিকও একমাত্র আল্লাহ। আর জাতির পথ প্রদর্শন করতে হবে অহির নূর দ্বারা। আর হুকুম হবে আল্লহ প্রদত্ত শরীয়ত অনুযায়ী। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, হুকুম দেয়ার মালিক জাতিই। যারা জাতিকে নিজেদের খেয়াল খুশী মত চালাবে তারা হচ্ছে জড়বাদী এবং মূর্তি পূজকদের নীতিসমূহ বাস্তবায়নকারী। তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধাচারণকারী। তারাই সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে ধোকাবাজি কথা বলে জোর জবরদস্তি করে জাতির উপর নানা ধরণের শোষণ চালিয়ে থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর বান্দগণের উপকারার্থে ব্যয় হবে। তাঁর আনুগত্যকারীদের নিরাপত্তার জন্যে, সীমান্ত রক্ষার কাজে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে যেখানে যত মুসলিম রয়েছে তাদের সব ধরণের অসুবিধা দূর করার জন্য এই সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথে আহবান করার কাজে, স্রষ্টার সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ও মিথ্যা আরোপকারীর অপবাদ খন্ডনের জন্য সব ধরণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেসব মুসলিম অন্যদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অথবা অভাবী মুসলিমদের অভাবসমূহ পূরণের জন্য ঐ সম্পদ ব্যয় করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয় কাজের মধ্য থেকে অধিক জরুরী ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবেই আল্লাহর দেয়া সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।

তা কারও ব্যক্তি স্বার্থে অথবা বিলাসিতার কাজে ব্যয় করা চলবে না। আর সাজ-সজ্জা, ফাসেকী পাপ কার্য যথাঃ সিনেমা, ক্লাব, মেলা ইত্যাদি জাতীয় যাবতীয় কাজে ব্যয় করার প্রশ্নই ওঠে না। কোন কোন রাজনৈতিক দলের ভাষায় দেশের সম্পদকে অমুক পার্টির সম্পদ বলা চলবে না। যদি এই কথা মেনে নেয়া হয়, তবে তা তারা যেভাবে খুশি সেভাবেই ব্যয় করতে পারে। উহা সকল স্তরের অভাবী মানুষের অভাব

পূরণের জন্য ব্যয় করা উচিত। যখন পার্টি বিশেষের সম্পদ বলে মেনে নেয়া হয় তখন ঐ পার্টির লোকেরা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য, গুপ্তচর বৃত্তি, অন্য আদর্শের লোকদের নিজের দলে ভিড়ানোর জন্য অথবা এই জাতীয় ক্ষতিকর কাজে ঐ সম্পদ নিঃশেষ করার একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হয়। (এই অংশটুকু ইমাম জুহুরী লিখিত "আল ওযুবা আল মুফিদাহ" গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে)।

প্রশ্নঃ সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজন যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা কি?

উত্তরঃ এ জাতীয় মতবাদের ভিত্তি নানাবিধ। তার মধ্যে আছে-

১। আল্লাহকে অস্বীকার করা। সমস্ত দ্বীন, রাসূল এবং রিসালাতকে অস্বীকার করা। তাদের মূল কথা হল, স্রষ্টা বা মা'বুদ বলে কিছু নেই। আর জীবন হচ্ছে পদার্থ হতে। ইহজগতেই ইহা সীমাবদ্ধ।

২। মানুষের সত্তা, মূল্যবোধ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত মর্যদা ধ্বংস করা।

৩। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

৪। ব্যক্তি মালিকানা বাতিল করে তা শাসকদের দখলে আনা। যা মানুষের অন্তরের একান্ত অভিলাষ।

প্রশ্নঃ কমিউনিষ্টদের ইসলাম ধ্বংস করার কলাকৌশল কি?

উত্তরঃ তাদের ইসলাম ধ্বংস করার কলাকৌশলের রাস্তা অনেক, যেমনঃ

১। যারা সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক, তারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করে না এবং দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের মনে হিংসা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক রীতি ও সমাজবদ্ধ জীবন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। আর এর বিপরীতে তারা যে সমাজ গড়তে চায় সেদিকে আহবান করে ও অন্ধ অনুসারী তৈরী করে।

২। ইসলাম ধ্বংসের জন্য তারা মেয়েদের ব্যবাহার করে, যাতে করে মুসলিম পরিবারের পর্দা প্রথা উচ্ছেদ হয়। কেননা, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা করা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ করে।

৩। তারা সমাজের শীর্ষ স্থানীয় (তথাকথিত বুদ্ধিজীবি) লোকদের এই কাজে ব্যবহার করে থাকে। কারণ ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা ঐ সমাজে সম্মান ও উঁচু পদ লাভ করার ফলে সাধারণ মানুষের মনে অতি সহজেই তাদের কথা রেখাপাত করে।

৪। তাদের কু-মতলব সিদ্ধির জন্য চিকিৎসক শ্রেণীকেও কাজে লাগায়। রোগীরা নিজেদের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে অপারগ, তদুপরি তাদের কাছ থেকে দু'একটি বিনামূল্যের ঔষুধ পেয়ে আরও দুর্বল হয়ে তাদের দিকে ঝুকেঁ পড়ে।

৫। এমনিভাবে শ্রেণী সংগ্রাম তথা বিপ্লবের সস্তা বুলি উপর মহল হতে প্রচারিত হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তারপর সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিজম প্রচার

করে ও ইসলামের ক্ষতি সাধন করে।

প্রশ্নঃ কাফিরদের রাষ্ট্রসমূহ কি ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ?

উত্তরঃ এ কথা সবার জানা যে, কাফিরদের দেশসমূহ, যদিও বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারা ভিন্নতর, তথাপি তারা মুসলিমদের ব্যাপারে শত্রুতা করতে একতাবদ্ধ। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা করে, মুসলিমদের কষ্ট দেয়া এবং ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য। ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য গোপনে কাজ করে এবং মুসলিমদের মধ্যে তাদের মতামত ছড়ায় যাতে তারা তাদের দ্বীনকে পরিত্যাগ করে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এদের পশ্চাদে আছে ইহুদী চক্র। তাদের উদ্দেশ্য হল, সমস্ত ধর্মীয় আদর্শ, চরিত্র ও ভিত্তিসমূহ ধ্বংস করা। এরা এ সমস্ত কাজ করে থাকে মাসুনিয়া, সুহুনিয়া, বাবিয়া ইত্যাদি দলের মাধ্যমে।

প্রশ্নঃ খৃষ্টবাদ কি? তার ক্ষতিকর দিক কি কি? আমরা কি ভাবে এর মুকাবিলা করব।

উত্তরঃ খৃষ্টবাদ হচ্ছে ধ্বংসকারী দল সমূহের নির্দিষ্ট একটি দল। যারা সর্বদা ইসলামকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। তাদের মূলনীতি হল ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করা। তাদের নিকৃষ্ট মতবাদের মধ্যে একটি দাবী হল এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। নাউযুবিল্লাহ! তাদের এই বিভ্রান্ত মতবাদ নানা ধরণের পত্রিকাসমূহে প্রচার করে এবং বিশেষ করে দুঃস্থ ও গরীব জাতিসমূহের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার চালায়। এদের ঘৃণ্য তৎপরতার মুকাবিলার রাস্তা হলো-আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে শক্ত ভাবে আকড়ে ধরা, সাহাবাগণের (রাঃ) আর্দশকে জরুরীভাবে বাস্তবায়ন করা এবং ইসলামী বই-পত্র অধ্যায়ন করা। আর এটাও জেনে নেয়া যে, খৃষ্টাবাদ হচ্ছে বিকৃত ধর্ম। সাথে সাথে ধনী মুসলিমগণের কর্তব্য হলো, তাদের ধন-দৌলত দ্বারা গরীব ফকিরদের সাহায্য করা।

খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদীতার জঘন্য কথার প্রতিবাদ করা এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ ও সৌন্দর্য বর্ণনা পদ্ধতি অগবতির জন্য শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) এর লিখিত “আল জওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মসিহ” এবং তার সাগরিদ হাফিজ ইবনে কাইয়ূম (রঃ) এর “হাদি ইয়াজুল হায়ারা ফি-রাদ্দে আলাল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা ও এগাসাতুল লাহফান” কিতাবগুলো অধ্যায়ন করুন।

প্রশ্নঃ ইসলামে কি সুফীবাদ অথবা অন্যান্য মতালম্বীদের (ফিরকা বন্দী) কোন স্থান আছে?

উত্তরঃ না, ইসলামে ঐ জাতীয় কোন মতবাদের স্থান ও মূল্য নেই।
১। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ٩٢ ﴾ الأنبياء: ٩٢

নিশ্চয় সমস্ত উম্মতই একই উম্মত। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। তাই একমাত্র আমারাই ইবাদত করতে থাক। (সূরা আম্বিয়া , ৯২)
২। অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ١٠٣ ﴾ آل عمران: ١٠٣

তোমরা সমবেত ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে (বিভিন্ন মাহাবে) বিভক্ত হয়ো না। (সূরা আম্বিয়া ১০৩) ৩।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿ ۞ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢ ﴾ الروم:

আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা। যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকটি দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে খুশী। (সূরা রুম, ৩১-৩২)
৪। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোজা রেখা টানেন। তারপর বললেনঃ ইহা আল্লাহর সরল সঠিক রাস্তা। তারপর তার ডান ও বামে আরও কয়েকটি দাগ টানলেন। তারপর বললেনঃ এগুলো হচ্ছে অন্যান্য রাস্তা। এই রাস্তাসমূহের মধ্যে এমন কোন রাস্তা নেই যে দিকে শয়তান ডাকছে না। তারপর কোরআনের ঐ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ١٥٣ ﴾ الأنعام: ١٥٣

আর অবশ্যই এটা আমার সরল সঠিক পথ। একে অনুসরণ কর এবং অন্য পথগুলো অনুসরণ কর না। তাহলে তারা তোমাদের আল্লাহর পথ হতে আলাদা করে ফেলবে।

(সূরা আন'আম, ১৫৩)
এটা আহম্মদ, নাসাঈর, সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসের স্বীকৃতি স্বরূপ।
৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা সরল সোজা রাস্তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। ঐ রাস্তার দু'পার্শ্বে দু'টি প্রাচীর বা দেয়াল রয়েছে এবং এতে রয়েছে খোলা দরজাসমূহ। প্রত্যেক দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। ঐ সরল সঠিক রাস্তার সামনে দাড়িয়ে এক আহবায়ক এই বলে ডাকতে থাকেঃ হে মানব মন্ডলী! তোমরা সকলে সরল সঠিক রাস্তায় প্রবেশ কর এবং দলে দলে ভাগ হয়ে যেওনা। আর একজন ডাকতে থাকে রাস্তার উপর হতে। এরপরও যখন কেউ ঐ দরজা সমূহের পর্দা খুলতে চেষ্টা করে তখন ঐ আহবায়ক ধিক্কার দিয়ে বলেঃ আফসোস! তোমার কি হয়েছে, তুমি ঐ পর্দা খুলে ফেল না। কেননা, ঐ পর্দা খুললে তুমি ওতে ঢুকে যাবে, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তা হতে আলাদা হয়ে যাবে। সরল সোজা রাস্তা হল ইসলাম, আর ঐ প্রাচীরদ্বয় হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের সীমারেখা। খোলা দরজা সমুহ হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত রাস্তা। সোজা রাস্তার প্রবেশ মুখের ঘোষক হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর রাস্তার উপরের ঘোষক হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যেক মু'মিনের দিলে তার নসিহতকারী। বা তার বিবেক। (বর্ণনায়, হাকেম, সহীহ সনদ)
প্রশ্নঃ দ্বীন কি শুধুমাত্র আল্লাহর, আর দেশ হচ্ছে জনগণের?
উত্তরঃ ইহা হচ্ছে শিরকের একটি বহিঃপ্রকাশ, যা ইউরোপবাসীরা প্রচলন করেছে। তদানীন্তন গীর্জার যালিম পাদ্রীদের অত্যাচার হতে দূরে থাকার জন্য, যাদের ইলমকে তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে বাধা বলে মনে করত। এ ধরণের মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্য যাতে তারা ধর্ম থেকে দূরে থাকতে পারে। তার পরবর্তী সময়ে তারা চেষ্টা করতে থাকল মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন হতে দূরে রেখে অন্ধকার ও ভ্রান্ত নীতিতে নিক্ষেপ করতে। তাদের বাচন ভঙ্গিতে এটাই পরিস্ফুট যে, দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর তাকে যেখানে খুশি নিক্ষেপ কর। জাতীয় কর্মকান্ডঃ যেমন দেশ পরিচালনা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। উপনিবেশবাদীদের এ ধরণের ধোকাবাজি কথা দ্বারা এ দেশের মানুষের মধ্যে সন্দেহ, গোমরাহি ছড়াতে চেয়েছিল যাতে লোকেরা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন না করে এবং দ্বীনকে সমস্ত ধরণের কাজ ও বিধি ব্যবস্থা হতে আলাদা করা যায়। আর এ ভাবেই তারা দেশকে আল্লাহর অংশীদার স্বরূপ বানিয়ে নেয় এবং দ্বীন হতে রাষ্ট্রকে পৃথক করতে চেষ্টা করে। কোরআনে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে, ঐ জাতীয় কথার আনুগত্য কিংবা সহযোগিতা না করতে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَـٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ ﴾ آل عمران: ١٤٩

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাদের পিছনে ফিরিয়ে নেবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা আল ইমরান, ১৪৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ كَـٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ ﴾ آل عمران: ١٠٠

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি ঐ লোকদের অনুসরণ কর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) তবে তারা তোমাদের ঈমান হতে বের করে কুফরীতে নিয়ে যাবে। (সূরা আল ইমরান, ১০০)

ইউরোপবাসীর প্রচারের কারণে খৃষ্টান মতবাদ প্রচারকারীদের আহবানের রাস্তা খুলে গেছে। ফলে, আজ মুসলিমদের ঘরে ঘরে নাস্তিকতার দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে। আর ইসলামের দিকে ডাকা হতে মুসলিমগণ দূরে সরে যাচ্ছে এবং খৃষ্টবাদ প্রচারের সম্মুখে ইসলাম প্রচারের গতি স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে মুসলিমগণ তাদের কোন ভ্রান্ত মতবাদ অস্বীকার করলে তারা বলে উঠে এটা মৌলবাদ। এটা চরমপন্থা। এট সাম্প্রদায়িকতা। এটা জঙ্গীবাদ ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ ধর্ম কি মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে?

উত্তরঃ সত্যিকারের ইসলামী দ্বীন হচ্ছে প্রকৃত ঐক্যের মূল উৎস। এর উপর 'আমল করলে ইজ্জত, দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা, একতা, হিফাজত, ভালবাসা, স্বার্থ ত্যাগ, অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার, অমুসলিমদের হিফাজত প্রভৃতি 'আমল এসে যায়। এমন অন্য কোন দ্বীন আছে কি যারা তাদের অনুসারীদের ডেকে বলেঃ

﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾ آل عمران: ٨٤

হে নবী বলুন! আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার

প্রতি ঈমান এনেছি। এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা মুসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ হতে প্রাপ্ত হয়েছেন তার উপর ঈমান এনেছি। আমারা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর আমরা আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করেছি। (সূরা আল ইমরান, ৮৪)

প্রশ্নঃ এটা কি বলা ঠিক যে, জাতির যা ইচ্ছা আল্লাহরও ইচ্ছা তাই ?

উত্তরঃ এই ধরণের মনগড়া বানানো মিথ্যা অপবাদ কিছু সংখ্যক বুজুর্গি ওয়ালারা (দার্শনিক) আল্লাহর উপর আরোপ করছে। এরূপ কথা আবু জাহেলের মত লোকও বলতে সাহস করেনি। যদিও তারা অত্যন্ত পাপাচারী ও আল্লাহদ্রোহী ছিল। সবচেয়ে বড় যে কথা তারা বলত তা হল আল্লাহর "ইচ্ছার" কথা।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ﴿٣٥﴾ ﴾ النحل: ٣٥

মুশরিকরা বলত, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো ইবাদত করতাম না। না আমরা, আর না আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কিছুকে হারাম বানাতাম। (সূরা নাহল, ৩৫)

আল্লাহ তাআলা তাদের চরম মিথ্যাবাদী বলেছেন। অন্যদিকে বর্তমান যামানার কিছুলোক জাতির ইচ্ছার নামে তাদের অপকর্ম চালাতে চাচ্ছে। তারা জাতির নামে যা খুশি করতে চাচ্ছে। তারা তাদের জীবন এমন ভাবে চালাচ্ছে যাতে আল্লাহর কিতাব ও শরিয়তের কোন বন্ধন নেই, বরং তাদের খায়েশ মাফিক বস্তুগত কর্মকান্ড, সেচ্ছাচারিতা ও শক্তিগত দিককেই প্রাধান্য দেয়। এই জাতীয় কথা ও মন্তব্য তাদেরকে মা'বুদের আসনে বসানো হয়। ফলে জাতি আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে পড়ে। আর তাদের মনের ইচ্ছাই শরীয়তের সমতুল্য হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের খেয়াল খুশিমত বিচার করে আল্লাহর আইনকে ছেড়ে দিয়ে, যেন তারাই শরিয়ত ও আইন নির্ধারক বনে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর সীমারেখাকে অতিক্রম করছে তাকে স্বীকার না করে এবং তার উপর আমল না করার কারণে।

প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলে দ্বীন হচ্ছে জাতির জন্য আফিম স্বরূপ- এ কথা কি সত্য?

উত্তরঃ একথা কার্লমার্কস নামক এক ইয়াহুদীর মতবাদ। সে কমিউনিজমের পত্তন করে ইসলামকে কবর দিতে চেয়েছিল। সে এ ধরণের কথা সাজিয়ে বলেছিল, যাতে

মানুষ ধারণা করে যে, দ্বীন-ধর্ম মাদক দ্রব্যের মত ক্ষতিকর জিনিস। একথা সত্যি হতে পারে অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মের ব্যাপারে। যাতে রয়েছে নানা ধরণের অপ্রচলিত নিয়মকানুন, মূর্তি পূজা ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকারের দ্বীনে হানিফ, যা সকল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, যা ইব্রাহীম(আঃ) এর মাধ্যমে এসেছে এবং যাকে কায়েম করতে আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন, তাদের তা মানুষের অন্তর ও অনুভূতিকে আকৃষ্ট করে। এ ধর্ম সমস্ত ধরণের অনুভূতি ও শক্তিকে নাড়া দেয় এবং এই ধর্মালম্বীদের সম্মুখপানে এগিয়ে দেয়। সে তার অনুসারীদের কোন রকম অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি বরদাশত করে না। বরং তাদের উপর সব ধরনের জিহাদকে ওয়াজিব করেছে যাতে করে আল্লহর বাণীকে সমুন্নত করা যায়। আর নানা ধরণের অপবাদকে ঘুচানো যায়। আর যারা দ্বীন-ধর্ম ও ন্যায়-নীতি হতে দূরে থেকে শরিয়তের বিধি বিধানকে অস্বীকার করে কিংবা রদবদল করে তাদের হতে পৃথক থাকতে উপদেশ দেয়।

প্রশ্নঃ সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে ইসলামী হুকুম প্রকাশ করার পূর্বে মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব হল এই যে, তাদের খোঁজ নেওয়া দরকার-ঐ বাণী প্রচারকদের আদর্শ ও নীতি তাদের নিজেদের কর্মজীবনে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা। এটা সত্যিই বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব কিনা। এই নীতির প্রচারকারী দুই ইয়াহুদী কালমার্কস ও লেনিন কিংবা তাদের অনুসারীরা কি বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে অথবা তারা কি কোরআন বা হাদীস হতে উহা গ্রহণ করেছে। যার ফলে মুসলিমরা উহা গ্রহণ করবে?

কিন্তু যেহেতু ঐ নীতি কোরআন হাদীস হতে তারা নেয়নি, তাই তাদের কথা প্রকৃত মুসলিমগণ কখনো গ্রহণ করতে পারে না। বরং প্রথম থেকেই উহা ত্যাগ করা তাদের জন্য অপরিহার্য। যখন কোন বুদ্ধিমান তাদের নীতি কথাগুলো পড়বে তখন সে দেখতে পাবে যে, উহা তাগুতদের কথায় পরিপূর্ণ। কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ আমাদের নিকট যা চায় তা হলো ঐ সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদকে পরিত্যাগ করা। কারণ, এই কালেমা হল মুসলিমগণের জীবন ও আমলের মূল মন্ত্র।

লেখক বলেনঃ নিশ্চয় ইসলাম সত্যিকার ভাবে ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তাআলার তরফ হতে নাযিল হয়েছে। তাই আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ছাড়া আমাদের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র কিংবা এ জাতীয় কোনটিরই প্রয়োজন নেই। আর যারা ইসলামের অনুসারী এবং কায়েম করে ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য ও স্বাধীনতা তারাই হল সৌভাগ্যবান, দুনিয়া ও আখিরাতে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ صِبۡغَةَ ٱللَّهِۖ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ١٣٨ ﴾ البقرة: ١٣٨

আল্লাহর রং, আর কে আছে রংয়ের দিক দিয়ে আল্লাহ থেকে উত্তম? আমরা সকলেই তার দাস। (সূরা বাক্বারাহ, ১৩৮)

প্রশ্নঃ মাসুনিয়া কি?

উত্তরঃ মাসুনিয়া হচ্ছে ইয়াহুদীদের একটি গোপন সংগঠনের নাম। যার অর্থ হচ্ছে "গোপণ শক্তি। প্রাথমিক অবস্থায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে, তাদের বাইবেলকে পরিবর্তন করে তাদের 'আক্বীদাহ্ ও চিন্তা ভাবনাকে যাতে পরিবর্তন করা যায় সে উদ্দেশ্যে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে নানা ধরণের বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অতঃপর যখন ইসলামের আলো মানুষের মাঝে ছড়াতে শুরু করে তখন তাদের ঘৃণ্য তৎপরতার সীমা উহার দিকে প্রসারিত করে। বিশ্বের ইয়াহুদী সম্পদ্রায় এই মাসুনিয়াদের সাহায্য করে থাকে বুদ্ধিজীবি ও কথিত সুশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমে ও তাদের ষড়যন্ত্রমূলক ধোকাবাজি ও ছল-চাতুরী দ্বারা। এরা প্রত্যেক যুগে ঐ যুগের রংয়ে রঞ্জিত হয়। প্রতিটি জাতি, গোত্র ও দেশের লোকদের সাথে তারা তাল মিলিয়ে চলে। এমন কি ব্যক্তিগত ভাবেও তারা মানুষের সাথে মিশে যায়। ফলে সহজেই তারা লোকদেরকে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনায় ফেলতে পারে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দেশে তাদের নানা ধরণের যে স্বীকৃতি মিলে তাতে দেখা যায় যে, মাসুনিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল ইয়াহুদীদের ঘৃণিত চিন্তাধারাগুলোকে বাস্তবায়ন করা। সাথে সাথে এর মাধ্যমে অন্যান্য দেশের শাসকদের বুদ্ধি বিবেককে পর্যন্ত তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তারা তাদের আত্মা, বুদ্ধিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে মাসুনিয়াদের কথাকে মান্য করতে বাধ্য হয়। এভাবেই মাসুনিয়ারা লোকদেরকে ধোকা দেয় তাদের অন্তরে প্রচন্ড রকমে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে। এই দলের সাফল্য স্বরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকাংশ নেতা ও শাসকদের নিজ দলে আনতে সক্ষম হয়েছে। তারা ইউরোপের বড় বড় শাসক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তাদের দলে নিয়ে নিয়েছে এবং আরব জগতের তথাকথিত অনেক চিন্তাবিদকে তাদের সংগঠনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। যখনই কোন এলাকায় তাদের ঘৃণ্য কর্ম তৎপরতার গোমর ফাঁস হয়ে যায় তখনই সেখানে তারা নানা ধরণের ধোকার রাস্তা গ্রহণ করে অথবা শাসকদের পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তারা আবার নতুন কোন সংস্থার নামে তাদের কাজ শুরু করে যা মূলতঃ ঐ মাসুনিয়াদেরই অন্য নাম। এভাবেই তারা নতুন নামে ইয়াহুদীদের খিদমত করতে শুরু করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তাদের যে সম্মেলন

হয় তাতে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বিশ্বজুড়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট গঠন করবে। যার ফলে এই রাষ্ট্রগুলি দ্বারা মাসুনিয়ারা উপকার লাভ করবে। তাদের দ্বারা যে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ অতীতে সংঘটিত হয়েছে তা হল ইঞ্জিলের (বাইবেল) পরিবর্তন ও নানা ধরণের অপচেষ্টার মাধ্যমে লোকদের বিভিন্ন দলে ও ধর্মে বিভক্ত করা। সাথে সাথে জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

ইসলামের শুরুতে তারা যা করতে পেরেছিল:

ক. দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা।

খ. তৃতীয় খলীফা উসমান (রাঃ) এবং তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

গ. নানা ধরণের মিথ্যা কথা প্রচার করা এবং সত্যকে আড়াল করে মিথ্যা প্রচারণার ফলে উসমান (রাঃ) কে শহীদ করা হয়।

ঘ. নানা ধরণের দলে বিভক্ত করার চেষ্টার ফল হল খারেজী ও নাসেবীদের উত্থান।

ঙ. জাহম ইবনে সফওয়ান এর মাধ্যমে জাহমিয়াদের নানা দলের মতবাদ প্রচার। এর মধ্যে আছে মুতাজিলা, কদরিয়া এবং অন্যান্যরা। এ ছাড়াও আছে কারামিতা, ও অন্যান্য বাতেনিয়া সম্প্রদায়।

চ. উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে নানা ধরণের মিথ্যা রটনা প্রচার । অন্যান্য অনারবদের সাথে মিলে মিশে নানা ধরণের মতবাদ প্রতিষ্ঠা। তারা ঐ যুগে এই সমস্ত কর্মের সাথে সাথে বিভিন্ন মিথ্যাবাদীদের তৈরী করেছিল তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য। এই সম্বন্ধে বিশেষ করে জানতে হলে ‘তারিখ উল জামি’য়িয়াতিস সিররিয়া ওয়াল হারাকাতিলহাদ্দামা ফিল ইসলাম’ গ্রন্থটি পড়তে হবে।

ছ. নানা ধরণের মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা যখন তখন যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিশেষ করে ক্রুসেডের যুদ্ধ। সাথে সাথে যারা তাদের অনুগত, তাদের নাম ঘটা করে প্রচার করা এবং তাদের মাধ্যমে যুদ্ধের দ্বারা নানা ধরণের বিভেদ সৃষ্টি করা। যেমন নাসির আততুসী, ইবনুলআলকামাহ, এবং অন্যান্যরা, যারা ছিল পূর্বের খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মাধ্যমে খৃষ্টানদের এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয় যে, তারা মুসলিম যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সমস্ত খৃষ্টানদের সাহায্য করতে যত ধরণের গুপ্তচর বৃত্তি করা এবং দেখানো দরকার সবই তারা করত। যুদ্ধের পর ঐ সব ষড়যন্ত্রের কথা তাদের খৃষ্টান আরবদের স্বীকৃতিতে প্রকাশ পায়। এটা প্রকাশ পায় জর্জ হাবাসের বক্তব্যেও। এই জাতীয় জাতীয়তাবাদীরা অজ্ঞতাও গোমরাহির কারণে এই সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না।

প্রশ্নঃ সুফীদের (পীরদের) ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি?

উত্তরঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীদের যামানায় পীর নামক ব্যক্তিদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু তার পরপরই যখন গ্রীকদের বই-পত্রগুলো আরবীতে অনূদিত হয়, তখন হতেই তার প্রভাব মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। সূফীবাদ "সুফিয়া" শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ (গ্রীক ভাষায়) হল "হিকমত"। অনেকে বলেনঃ সুফ বা পশম শব্দ হতে উহা গৃহীত হয়েছে। যে পোশাক তারা পরিধান করত তাকে সুফ বলা হত। অনেকে বলেনঃ "সাফা" হতে। কিন্তু উহা সঠিক নয়। সুফী বা পীরেরা ইসলামের অনেক হুকুম আহকামেরই বিরোধিতা করে থাকে, যেমনঃ

১। গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করাঃ বেশীর ভাগ সুফীরাই মৃত গাইরুল্লাহদের নিকট দু'আ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "দু'আ হচ্ছে ইবাদত"। (বর্ণনায় তিরমিযি, হাসান সহীহ)

ইবাদতকে অন্য কারো জন্য নিবেদন করা, বিশেষ করে গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করা বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত। এতে সমস্ত 'আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ ﴾ يونس: ١٠٦

আর আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন কাউকে ডেক না, যে না তোমার কোন উপকার করতে পারে বা ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি ইহা কর, তবে অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনাস, ১০৬)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ ﴾ الزمر: ٦٥

যদি তুমি কোন শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার ৬৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লহর সাথে অন্যকে শরিক করত তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বর্ণনায় বুখারী)

২। বেশীর ভাগ সুফীরা এই ধারনা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা সর্ব

স্থানেই বিরাজমান। এই কথা কোরআনের বিরোধী, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥ ﴾ طه: ٥

আল্লাহ- রহমান আরশের উপর আছেন। (সূরা ত্বাহা, ৫)
অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش (متفق عليه)

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এক কিতাব লিখেছেন, যা তাঁর নিকট আরশের উপর আছে। (বর্ণনায়: বুখারী ও মুসলিম)
আর আল্লাহ যে বলেছেনঃ

وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ ٤ ﴾ الحديد: ٤

আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন, যেখানেই তোমরা থাকনা কেন । (সূরা হাদীদ, আয়াত ৪)
এ কথার অর্থ হল, তাঁর ইলমের দ্বারা, শ্রবনের দ্বারা. দেখার দ্বারা তিনি সকলের সাথে আছেন। এগুলো তফসীর-কারকগন আয়াতের বিশ্লেষণে বলেছেন।
৩। কোন কোন সুফী এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ তার কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। এমন এক তথাকথিত বিখ্যাত সুফী ইবনে আরাবী, যার কবর দামেশকে আছে। সে বলেছেঃ আল্লাহ্ হকই বান্দা, আর বান্দাই হক তা আলা। হায়! তাহলে কে কার ইবাদত করবে!
সে আরও বলেঃ কুকুর আর শূকর সবার মোদের মাবূদ, আল্লাহতো গির্জার পাদ্রী ছাড়া কেউ নয়। (নাউযুবিল্লাহ)!
৪।বেশীর ভাগ সুফীই এই ধারণা পোষণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণে। তাদের এই বক্তব্য কুরআনের ঐ কথার বিপরীত যাতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾ الذاريات: ٥٤ - ٥٦

নিশ্চয় আমি জ্বীন ও মানুষদের সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য। (সূরা যারিয়াত, ৫৬)
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ ١٣ ﴾ الليل: ١٣

আর নিশ্চয় আখিরাত ও দুনিয়া আমারই জন্য। (সূরা লাইল, ১৩)

৫। বেশীর ভাগ সুফীই এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাআলা তার নূর হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সৃষ্টি করেছেন। আর অন্যান্য জিনিস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন প্রথম সৃষ্টি। এই সমস্ত কথাই কোরআনের বিপরীত, যাতে বলা হয়েছেঃ

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ ﴾ ص: ٧١

যখন তোমার রব মালাইকাদের (ফিরেশতাদের) বললেনঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করছি মাটি হতে। (সূরা সোয়াদ, ৭১)

তাই আদম (আঃ) মানুষদের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি, যাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে আরশ ও পানির পর কলমকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহপাক সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেন কলম। (বর্ণনায় আহমদ, তিরমিযি, হাসান সহীহ)

যে হাদীসে বলা হয়েছেঃ "হে জাবের, সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন" –সে সম্বন্ধে বেশীর ভাগ হাদীস বিশারদগণ বলেন যে, এর কোন সহীহ সনদ নেই। উহা বানোয়াট ও বাতিল।

৬। সুফীদের শরীয়তের মুখালেফ (পরিপন্থী) অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে, আউলিয়াদের নিকট নযর বা মানত দেয়া। তাদের কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ বা ঘুরা, কবর পাকা করা, এমনভাবে জিকির করা যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত নয়। জিকির করার সময় নৃত্য করা, শরীরের মধ্যে লোহা প্রবেশ করানো, আগুন গিলে খাওয়া, তাবিজ কবজ, যাদু, নানা ধরণের ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করা, অন্যায় ভাবে মানুষদের বুঝ দিয়ে তাদের টাকা পয়সা ভক্ষণ করা, তাদের নানাভাবে ধোকা দেয়া ও এই জাতীয় অন্যান্য কাজ।

প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলে থাকেঃ ইসলাম মানুষকে পশ্চাদপদ করে তোলে- এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তরঃ এই ধরণের ঘৃণ্য অপবাদ ইসলামের শত্রুরাই করে থাকে। যাতে করে ইসলামের অনুসারীরা ইসলাম হতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের কথায় এটাই তারা বুঝাতে চায় যে, দ্বীন প্রচীন পন্থা। বর্তমান যুগের সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে তা চলতে পারে না।

এগুলি মিথ্যা ও ধোকাবাজীর কথা। কারণ, ইসলাম সর্বদাই ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে

হুকুম করে। মানুষদের প্রেরণা দেয় এবং উদ্বুদ্ধ করে নতুন নতুন আবিষ্কার এবং ভাল কাজের জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ ﴾ الأنفال: ٦٠

আর তাদের জন্য তৈরী হও, তোমাদের সাধ্যমত সমস্ত ধরণের শক্তি নিয়ে। (সূরা আনফাল, ৬০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা দুনিয়ার কার্যের ব্যাপারে বেশী অবগত আছ। (মুসলিম)

ইসলাম সর্বদা হুকুম করে, যে কোন কাজে কোরআন, হাদীস ও সাহাবীদের আমলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে। কারণ, সাহাবীগণ দেশের পর দেশ জয় করেছিলেন তাদের ঈমান, আক্বীদাহ, উত্তম চরিত্র ও জিহাদের মাধ্যমে। ফলে তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের মানুষের গোলামী হতে বের করে আল্লাহর গোলামীতে লিপ্ত করেছিলেন। মানুষ নানা ধরনের বিকৃত ধর্ম হতে বের হয়ে ইসলামের ন্যায় বিচারের ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছিল। মুসলিমদের কোন ইজ্জত হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের ধর্মের দিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রশ্নঃ আমাদের কি বর্তমান যুগের মূল চ্যালেঞ্জগুলো ও সূফীদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা দরকার?

উত্তরঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের তাদের সম্বন্ধে জানা দরকার, যাতে করে আমরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ জেনে নিয়ে তাদের থেকে সাবধান হতে পারি।

দলিলঃ হুযাইফা (রাঃ) বলতেনঃ লোকেরা সর্বদা রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করত, আর আমি সর্বদা তাকে খারাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতাম এই ভয়ে যে, হয়ত উহা আমাকে পাকড়াও করবে। একদা আমি প্রশ্ন করলামঃ হে আল্লহর রাসূল! এক সময় আমরা জাহেলিয়াত ও পাপাচারের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কল্যাণ দান করেছেন। এই কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণ আছে? বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ ঐ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে ঐ কল্যাণের মধ্যে ফাসাদ ও মতবিরোধ আছে। তখন বললামঃ ঐ অকল্যাণ কি কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ একটি দল আমার সুন্নতকে ছেড়ে অন্য সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে। আর আমার হিদায়েতর রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। তাদের তোমরা জানবে এবং অস্বীকারও করবে। বললামঃ ঐ কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আছে? এবারে

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, জাহান্নামে দরজার নিকট হতে ঘোষক ডাকবে। যারা তাদের কথা শুনবে, তাদেরকে তারা উহাতে নিক্ষেপ করবে। বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেনঃ ঐ লোকেরা আমাদের মতই রক্ত মাংসের হবে এবং আমাদের মতই কথা বলবে। আমি তখন বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি ঐ সময় বেচেঁ থাকি তবে আমাকে উপদেশ দিন তখন আমি কি করব? বললেনঃ তখন মুসলিমদের জামাত (দল) ও তাদের ইমামের সাথে থাকবে। আমি বললামঃ যদি তখন মুসলিমদের জামাত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেনঃ তখন ঐ সমস্ত দলের সকলকে পরিত্যাগ কর। যদি দরকার হয়, তবে,গাছের কান্ডকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে থেক যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু এসে উপস্থিত না হয়। (বর্ণনায় মুলিম)

এই হাদীস হতে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, যারা অকল্যাণের দিকে ডাকে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে চলে না। না তাদের জীবনের চলার পথে, না আদর্শে, না বিচারের মধ্যে, না তাঁর জীবনের আদব, নিয়মকানুন, তাদের পোশাক, অভ্যাস ও চালচলনে। তাই মুসলিমদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে সাবধান হওয়া।

দাওয়াত ও বই-পত্র প্রকাশ প্রচার

প্রশ্নঃ দাওয়াতের কাজ ও পুস্তক প্রকাশের লাভ কি, যদিও কোন কোন দেশে মুসলিমদের যবেহ করা হচ্ছে?

উত্তরঃ প্রতিটি মুসলিমই ইসলামের সীমান্ত রক্ষাকারী অতন্দ্র প্রহরী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধে, জিহাদের কলা-কৌশল উত্তমরূপে অবগত আছে। কেউ কেউ মুখের দ্বারা উত্তমরূপে দাওয়াত দিতে পারে আবার কেউ কেউ তাদের সম্পদ খরচ করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত কার্যের প্রতিই ইশারা করে বলেছেনঃ

وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم (رواه أبوداود)

তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে থাক তোমাদের ধন-সম্পদ, জীবন ও বাক-শক্তি দ্বারা। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

এই কারণে হাসসান (রাঃ) ইসলামের পক্ষে লড়াই করতেন বাকশক্তি দিয়ে। সাহিত্য ও কবিতা দিয়ে ইসলাম বিরোধীদের মুকাবেলা করতেন। কোন মুসলিম এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবে না যে, অস্ত্র ও বাক-শক্তি দ্বারা জিহাদ করা প্রতিটি

মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আর যদি বই-পত্র, সাময়িকী ও প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবে তা জিহাদের এক বিশেষ কাজ বলে বিবেচিত হবে।

সাথে সাথে ঐ সমস্ত কিতাব যা কোরআন ও সুন্নাহ হতে নেয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে যে সমস্ত বিদআত, ভ্রান্তি প্রবেশ করেছে, তা আক্বীদা-বিশ্বাসের মধ্যেই হোক কিংবা ইবাদত বা মোয়ামালাতের মধ্যেই হোক, তাদের দূরীভুত করাটাও অত্যন্ত দরকারী কাজ। বর্তমান সময়ে বই-পত্র প্রকাশ ও প্রচার করা ঐ ধরনের প্রচার মাধ্যমের কাজ করছে, যাতে উপরোক্ত ক্ষতিগুলো দূরীভূত হয়। সাথে সাথে যুবকদের উত্তমরূপে ইসলামী আক্বীদাহ, ইবাদত, হুকুম, জিহাদ, কোরবানী ইত্যাদির উপর গড়ে তোলা দরকার। তার চালচলন, চরিত্র গঠন, প্রতিপালন, রাষ্ট্র গঠন সমস্ত কিছুই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কেন ফিতনাকে হত্যা হতেও বেশী মারাত্মক বলেছেন?

উত্তরঃ মানুষের জীবন বড়ই উত্তম জীবন। এর অন্তর্ভূক্ত হল, তার বিশুদ্ধ ধর্ম, উত্তম চরিত্র, সুষ্ঠ বুদ্ধি, এবং এমন এক আক্বীদা যা শিরক মুক্ত। যদি তাকে মানসিক ভাবে হত্যা করা হয়, বিশেষ করে তার বুদ্ধি বিবেককে, তবে এই হত্যা শারীরিকভাবে জীবন নাশ করে হত্যা হতেও জঘন্য।

এজন্য আল্লাহ তালা বলেনঃ

﴿ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴿١٩١﴾ ﴾ البقرة: ١٩١

এবং ফিৎনা কতল (হত্যা) হতেও জঘন্য। (সূরা আল-বাক্বারাহ, ১৯১)

এখানে ফিৎনা বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴿٢١٧﴾ ﴾ البقرة: ٢١٧

ফিৎনা হত্যা হতেও বড়। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২১৭)

প্রশ্নঃ যারা ইসলাম হতে বিচ্যুত তাদের প্রশংসা করা কি জায়েয?

উত্তরঃ না, তাদের প্রশংসা করা জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা, ঐ সমস্ত লোক, যারা ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মাদর্শ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে শরিয়ত হতে দূরে সরে গেছে তাদের জ্ঞান বুদ্ধির স্বল্পতার কথা বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ ﴿١٣٠﴾ ﴾ البقرة: ١٣٠

আর যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ (মিল্লাত) থেকে বিমুখ হতে পারে। (সুরা বাক্বারাহ,১৩০

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা, যারা আসমানী কিতাবসমূহ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, তাদের গাধার সাথে তুলনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوۡرَىٰةَ ثُمَّ لَمۡ يَحۡمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلۡحِمَارِ يَحۡمِلُ أَسۡفَارَۢاۚ ﴿٥﴾ ﴾ الجمعة: ٥

যে সমস্ত লোকেরা তাওরাত বহন করার (আমল করার) পরে আর তা বহন করেনি তাদের উদাহরণ হচ্ছে গাধার মত, যারা শুধু কিতাব বহন করে। (সূরা জুমুআ, ৫)

অন্যত্র, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে দূরে সরে গেছে তাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخۡلَدَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ تَتۡرُكۡهُ يَلۡهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَاۚ فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ ﴾ الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦

আর আপনি তাদের সামনে ঐ খবর পাঠ করুন যাদের আমি আমার আয়াত সমূহ দান করেছিলাম, তারপর তারা উহা হতে বিচ্যুত হয়, আর শয়তান তার অনুসরণ করে। ফলে সে দুর্ভাগাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর যদি আমি চাই, তবে আমি উহার দ্বারা তাকে সম্মানিত করতে পারি। কিন্তু সে জমিনে নিজকে চিরস্থায়ী করতে চায়, আর সে তার নফসানিয়াত অনুযায়ী চলতে চায়। তার উদাহরণ হচ্ছে এক কুকুরের মত, যদি তার উপর বোঝা চাপানো হয় তখান যেমন জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে তেমনি বোঝা না দিলেও হাঁপায়। উহা হচ্ছে ঐ কাওমের লোকদের উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। অতএব, তাদের সামনে এই ঘটনাসমূহ পেশ করুন, হয়ত তারা চিন্তা করবে। (সূরা আ’রাফ, ১৭৫-১৭৬)

তাই যে সমস্ত ব্যক্তিরা ঐ ধর্মচ্যুত (মুরতাদ) লোকদের প্রশংসা করে, অথচ আল্লাহ

তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন, তারাতো আল্লাহর সীমা অতিক্রমকারী। ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা, যারা ইসলামের শিক্ষা হতে বিচ্যুৎ অথবা তার সীমাকে অতিক্রমকারী অথবা শরীয়তকে ত্যাগ করে অন্য আইনে বিচারকারী তাদের কোন রকম প্রশংসা সূচক কোন কথায় ভুষিত করা যাবে না। সে লোক যত বড় সম্মানিতই হোকনা কেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (মুনাফিকদেরকে আমাদের নেতা বলে সম্বোধন কর না। যদি সে সত্যই তোমার কাছে সম্মানীয় হয় তবেতো তোমারা তোমাদের রবকে রাগান্বিত করলে। (বর্ণনায় সহীহ আহমদ, আবুদাউদ)

সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের গুরুত্ব

প্রশ্নঃ সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইসলাম কি কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

উত্তরঃ এর জন্য নানাবিধ পন্থা আছে।

১। মুসলিমদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করা। যেমন, গরীবদের যাকাত দেয়া।

২। সামাজিক জীবনকে প্রাধান্য দেয়া। যেমন, সাদাক্বাহ্, খয়রাত দেয়া এবং উপহার হাদীয়া দেয়া।

৩। তাদেরকে নিজেদের সকল সদস্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করা।

৪। ঈমান, সাহায্য উপদেশ, ভালবাসা ইত্যাদির ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা করা।

প্রশ্নঃ ইসলামিক সামাজিকতার এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ উত্তম সমাজ গঠন করার মধ্যে আছে উন্নতি ও সমৃদ্ধি। ইসলাম হচ্ছে প্রথম শরীয়ত যা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সামাজিক অধিকার রক্ষা করে, যাদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমগণ যেভাবে সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করছে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১। মানুষদের সর্বদা উপদেশ দান করে ও সঠিক রাস্তা দেখায়।

২। প্রত্যেক অসমর্থ ও অভাবী লোকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করে।

৩। যারা কাজ করতে সমর্থ তাদের প্রত্যেককে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়।

৪। অসুস্থ ও অসমর্থ ব্যক্তি এবং মুসাফিরদের জন্য সরাইখানায় থাকার ব্যবস্থা করা

৫। এতিম ও মিসকিনদের যত্ন নেয়া।

৬। যাকাত ও সাদাক্বাহ সংগ্রহ করে উহা সত্যিকারের পাওনাদারদের নিকট পৌছায়

ছোট শিরক ও তার প্রকার ভেদ

প্রশ্নঃ ছোট শিরক কি?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে রিয়া বা লোক দেখান ‘আমল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠ ﴾ الكهف: ١١٠

আর যে তার রবের সহিত সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেন নেক ‘আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। (সূরা কাহাফ, ১১০)
রাসূল তার উম্মতদের সাবধান করে বলেনঃ

إن اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر (رواه احمد)

আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে যার বেশী ভয় পাই তা হল ছোট শিরক অর্থাৎ রিয়া। (বর্ণনায় আহমদ)
ছোট শিরকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কথাঃ যদি আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তি না থাকত। আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও। যদি কুকুরটা না থাকত তবে অবশ্যই চোর প্রবেশ করত ইত্যাদি।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা একথা বল না যে, যা আল্লাহ চান এবং অমুকেও চায়। বরং তোমরা বলঃ আল্লাহ যা চান তারপর অমুকে যা চায়। (বর্ণনায় আহমদ)
প্রশ্নঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া জায়েয কি?
উত্তরঃ না, উহা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ٧ ﴾ التغابن: ٧

হে নবী বলুন, আমার রবের কসম! অবশ্যই তোমাদের পুনর্জীবিত করা হবে। (সূরা তাগাবুন, ৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেনঃ

من حلف بغير الله فقد اشرك (رواه احمد)

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম খায় সে যেন শিরক করল। (বর্ণনায় আহমদ)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলেনঃ যে ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা চুপ করে থাকে। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
এমনকি কোন আউলিয়া বা নবীর নামে কসম করাও বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে। সে যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, এই অলি অকল্যাণ হতে রক্ষা করতে পারে, আর

তার নামে কোন মিথ্যা কসম করলে কসমকারীর ক্ষতি হবে, তাহলে সেটা যে বড় শিরক তাতে কোন সন্দেহ নাই।
প্রশ্নঃ সুস্থতা লাভের জন্য আমরা কি হাতে বা কোমরে সুতা বাঁধাব অথবা লোহার কিংবা অন্য কোন ধাতুর বালা অথবা রিং পড়ব?
উত্তরঃ না, আমরা ব্যবহার করব না।
১। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴾ الأنعام: ١٧

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন ক্ষতি করতে চান তবে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উহা দূর করতে পারে না। (সূরা আন'আম ১৭)
২। সহীহ ইবনে আবি হাতিম হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হুযাইফা (রাঃ) কোন এক ব্যক্তির জ্বরের কারণে তার হতে একটি সুতা বাঁধা দেখতে পেলেন। তখন তিনি সাথে সাথে ঐ সুতার বাঁধন কেটে ফেলে দিলেন। তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ يوسف: ١٠٦

আর বেশীর ভাগ লোকই আল্লাহর উপর ঈমান আনে তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায়।
(সূরা ইউসূফ, ১০৬)
প্রশ্নঃ আমরা কি চক্ষু লাগা হতে বাঁচার জন্য হাতে বা অন্যত্র তাবিজ বাঁধব?
উত্তরঃ না, উহার জন্য আমরা এমন কাজ করব না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴾ الأنعام: ١٧

আর যদি আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চান তবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ উহা দূর করতে পরে না। (সূরা আন'আম, ১৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

من علق تميمة فقد أشرك (رواه احمد)

যে ব্যক্তি তাবিজ পরিধান করল সে যেন শিরক করল। (বর্ণনায় আহমদ)
প্রশ্নঃ কখনও কখন কি ছোট শিরক বড় শিরকের পর্যায়ে পৌছেঁ?
উত্তরঃ হ্যাঁ, যখন কোন মুসলিম এই আক্বীদা পোষণ করে যে, তাবিজ, সুতা বা কোন বালা ইত্যাদি ব্যবহার করলে উহারা নিজেরাই তার উপকার করবে। অথবা এই ধারণা পোষণ করে যে, কোন অলির নামে মিথ্যা কসম করলে সে তার ক্ষতি

করবে। তার ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা তার আছে, তবে এগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত হবে।

প্রশ্নঃ ছোট শিরকের ব্যাপারে হুকুম কি?

উত্তরঃ উহাদের ব্যাপারে হুকুম হল, উহারা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। উহা হতে তাওবাহ্ করা ওয়াজিব। ছোট শিরককারী বড় শিরককারীর মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে না অথবা উহার কারণে অন্যান্য আমলও নষ্ট হবে না।

প্রশ্নঃ কিভাবে মুসলিমগণ বড়ও ছোট শিরক হতে রক্ষা পাবে?

উত্তরঃ মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল, বড় ও ছোট শিরক আমল করা হতে দূরে থাকা। সাথে সাথে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উহা হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য দু'আ শিখিয়েছেন তা পাঠ করা।

আমাদের বলতে হবেঃ হে আল্লাহ্ আপনার নিকট যে কোন ধরণের শিরক করা হতে বাঁচতে চাই। যে সকল শিরক সম্পর্কে জ্ঞাত আছি, আর যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত নই উহা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অসিলা ও শাফায়াত চাওয়া

প্রশ্নঃ কিভাবে আমরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট অসিলা ভিক্ষা করব?

উত্তরঃ কিছু কিছু অসিলা আছে যা জায়েয (শরিয়ত সম্মত) আর কিছু আছে নিষিদ্ধ।

১। জায়েয ও আকাংখিত অসিলাঃ তা হল আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ ও উত্তম গুণাবলী ও নেক আমল সমূহকে অসিলা করা। আর সাথে সাথে নেককার জীবিত ব্যক্তিদের নিকট দু'আ চাওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ ﴿١٨٠﴾﴾ الأعراف: ١٨٠

আর আল্লাহ্ তাআলার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ আছে, তাদের অসিলায় তার নিকট দু'আ কর। (সূরা আ'রাফ ১৮০)

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴿٣٥﴾﴾ المائدة: ٣٥

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ-কে ভয় কর এবং তাঁর নিকট অসিলা তালাশ কর। (সূরা মায়িদাহ ৩৫)

অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য হাসিল কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং ঐ সমস্ত আমলের

দ্বারা যা তাকেঁ খুশী করে। এ কথা ইবনে কাসীর কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . رواه احمد

আমি আপনার নিকট ঐ সমস্ত নামের অসিলায় দু'আ করছি যা দ্বারা নিজেকে বিভূষিত করেছেন। (বর্ণনায় আহমদ)

সাহাবী রাবিয়াহ ইবনে কাআব আল আসলামী (রাঃ) যখন রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে থাকার ইচ্ছা করলেন তখন তার উত্তরে বলেনঃ

فأعني على نفسك بكثرة السجود

তাহলে বেশী করে সেজদার মাধ্যমে আমাকে তোমার ব্যাপারে সাহায্য কর। (বর্ণনায় মুসলিম)

অর্থাৎ বেশী বেশী সালাত অর্থাৎ নেক আমল দ্বারা।

একই ভাবে দেখা যায়, গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির কাহিনীতে। তারা তাদের নেক আমল বা সৎ কাজের অসিলায় দু'আ করেছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন। আল্লাহ তাআলাকে যে আমরা ভালবাসি, তার অসিলায় দু'আ করাও জায়েয। সাথে সাথে তাঁর নবী ও অলিদের প্রতি যে আমাদের ভালবাসা আছে, তার অসিলা করাও জায়েয। কারণ, তাদেরকে ভালবাসা নেক আমলের শামিল। যেমন বলাঃ হে আল্লাহ, আপনার রাসূল ও আউলিয়াদের প্রতি যে আমাদের ভালবাসা আছে, সেই অসিলায় আমাদের সাহায্য করুন, আর তাদের প্রতি যে আমাদের ভালবাসা আছে সে অসিলায় আমাদের সুস্থতা দান করুন।

২। নিষিদ্ধ অসিলাঃ উহা হচ্ছে মৃতদের নিকট দু'আ করা। তাদের নিকট নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া যা বর্তমান যামানায় দেখা যায়। উহা বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ ﴾ يونس: ١٠٦

আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ডেক না, যারা না তোমাদের কোন উপকার করতে পারে, আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি তা কর, তবে নিশ্চয় তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০৬)

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের অসিলায় যেমন বলাঃ হে আমার রব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় আমাকে সুস্থতা দান

করুন। ইহা বিদ'আত। কারণ, সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) কেহই ইহা করেননি। আর ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) এর দু'আর দ্বারা অসিলা করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর কেহ তাঁর অসিলায় দু'আ করেননি।

এই জাতীয় অসিলা তালাশ করা মানুষদের শিরক পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। যখন কেউ এই ধারনা করে যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পেতে হলে মানুষদের মত মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন, তখন তা স্পষ্ট শিরক। যেমন আমীর বা শাসকবৃন্দের নিকট যেতে হলে মধ্যস্থ দরকার তেমনি যদি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও ধারনা করা হয় তাহলে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করা হয়ে যায়।

আবু হানিফা (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছু চাইতে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের অসিলা করাকে আমি অপছন্দ করি। (দুররে মুখতার)

প্রশ্নঃ দু'আতে কি কোন সৃষ্টির অসিলা করা প্রয়োজন?

উত্তরঃ না, এই ধরণের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ﴿١٨٦﴾ ﴾ البقرة: ١٨٦

আর যখন আমার বান্দা আপনার নিকট আমার কথা জিজ্ঞেস করে তখন (তাদের বলুন) নিশ্চয় আমি অত্যন্ত নিকটে। (সূরা বাক্বারাহ, ১৮৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. رواه مسلم

নিশ্চয় তোমরা এমন এক সত্বাকে ডাকছ যিনি অত্যন্ত নিকটে ও সর্বশ্রোতা এবং তোমাদের সাথেই আছেন। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ জীবিত ব্যক্তিদের নিকট দু'আ চাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ জীবিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট দু'আ চাওয়া জায়েয। আল্লাহ তালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবিত অবস্থাতেই তাকেঁ সম্বোধন করে বলেনঃ

﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴿١٩﴾ ﴾ محمد: ١٩

আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার গুনাহের জন্য, আর সাথে সাথে মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। (সূরা মুহাম্মদ ,১৯)

একদিন এক চোখ কানা এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

এসে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যাতে আমাকে সুস্থ করে দেন। তিনি বলেনঃ যদি চাও, তবে তোমার জন্য দু'আ করব। কিন্তু যদি পার তবে সবর কর। উহাই তোমার জন্য উত্তম।

প্রশ্নঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যম কি?

উত্তরঃ তাঁর মাধ্যম হল তাবলীগ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ ﴿٦٧﴾ ﴾ المائدة: ٦٧

হে রাসূল ! আপনার রবের নিকট হতে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। (সূরা মায়িদাহ, ৬৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আল্লাহ ! আপনি স্বাক্ষী থাকুন। একথা তখন বলেছিলেন, যখন সাহাবায়ে কিরাম বলেনঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় সঠিকভাবে বার্তা পৌছিয়েছেন। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ কার নিকটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত প্রার্থানা করব?

উত্তরঃ তাঁর শাফায়াত একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করব। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ ﴿٤٤﴾ ﴾ الزمر: ٤٤

হে নবী বলুনঃ সমস্ত শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর জন্য। (সূরা যুমার, ৪৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলতে শিখিয়েছেনন:

আল্লাহুম্মা শাফফিহু ফিইয়া। অর্থাৎ হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার জন্য শাফায়াতকারী বানিয়ে দিন। (বর্ণনায় তিরমিযি, হাসান সহীহ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . فهي نائلة ، إن شاء الله ، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.

رواه مسلم

আমি আমার ঐ দু'আকে গোপন রেখেছি, যে দু'আদ্বারা আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করব। আমার ঐ সমস্ত উম্মতের জন্য শাফায়াত, যারা মারা গেছে কিন্তু কোন শিরক করে নাই। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ আমরা কি জীবিতদের নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করব?

উত্তরঃ দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের নিকট ইসলাম সম্মত শাফায়াত (সুপারিশ) তালাশ করা যাবে।
আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴿٨٥﴾ ﴾ النساء: ٨٥

যে উত্তম সুপারিশ করবে, তার ভাগ্যেও উহার কিছু মিলবে। আর যে নিকৃষ্ট শাফায়াত করবে তার ভাগ্যেও ঐ নিকৃষ্ট জিনিসই মিলবে। (সূরা নিসা, ৮৫)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ শাফায়াত কর, প্রতিদান পাবে। (বর্ণনায় আবুদাউদ)
প্রশ্নঃ আমরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করব?
উত্তরঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা অবশ্যই করব। তবে উহাতে আমরা বাড়াবাড়ি করব না।
আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

হে নবী বলুন, আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমার নিকট ওহি প্রেরণ করা হয়। নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক ও অদ্বিতীয়। (সূরা কাহাফ, ১১০)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না, যেমন ভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একমাত্র আল্লাহর বন্দা। তাই বল, আল্লাহর বান্দাও তার রাসূল। (বর্ণনায় বুখারী)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার ব্যাপারে যা কোরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে তাকে অবশ্যই করতে হবে। কারণ উহা তাঁর পাওনা।
প্রশ্নঃ প্রথম সৃষ্টি কি কি?
উত্তরঃ মানুষদের মধ্যে আদম (আঃ)। আর অন্যদের মধ্যে আরশ, তারপর কলম।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن طِينٖ ٧١ ﴾ ص: ٧١
আর যখন তোমার রব মালাইকাদের (ফিরেশতাদের) বললেনঃ নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা সোয়াদ, ৭১)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

كلكم بنو آدم وآدم من تراب . رواه البزار

তোমরা সকলে আদমের সন্তান। আর আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বর্ণনায় বাজ্জার)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إن أول ما خلق الله القلم. رواه أبوداود الترمذي حسن صحيح

আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। অর্থাৎ পানি ও আরশের সৃষ্টির পর তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন।
(বর্ণনায় আবু-দাউদ, তিরমিযি, হাসান সহীহ)
আর যে হাদীসে বলা হয়েছেঃ হে যাবের ! আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন- উহা মউদু বা বানোয়াট হাদিস, উহার কোন সনদ নেই।
প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর হতে, না বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা অন্যান্য মানুষের মতই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ٦٧ ﴾ غافر: ٦٧

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর বীর্য হতে। (সূরা গাফির, ৬৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি পিতা-মাতান মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছেন। অন্যান্য মানুষরা যেমনি ভুমিষ্ট হয়, তিনিও তেমনি ভুমিষ্ঠ হয়েছেন। তাকে অন্যান্যের মতো রোগ, ক্ষুধা, পিপাসা ও কষ্ট স্পর্ষ করত। অহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছেন, এবং এই জাতীয় অন্যান্য সাধারণ অবস্থা, যা অন্য মানুষদের ব্যাপারে ঘটে থাকে তার ব্যাপারেও ঘটেছিল। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হুকুম করেছেন তাঁর অনুসরণ করতে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ ٢١ ﴾ الأحزاب: ٢١

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা

আল আহযাব: ২১)

জিহাদ, বন্ধুত্ব এবং বিচার

প্রশ্নঃ জিহাদ কাকে বলে ? উহার শ্রেণী বিভাগ কি কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি ?

উত্তরঃ জিহাদ হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানীত একটি আমল। আর যারা সামর্থ রাখে, তাদের উপর ইহা অতি অবশ্যই ওয়াজিব। আর সামর্থ থাকা সত্বেও কেহ যদি উহাতে অংশ গ্রহণ না করে, তবে তার ধর্মের ব্যাপারে আশংকা আছে। এটা ইমামদের সর্বসম্মত বক্তব্য। বিশেষ করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর অভিমত হল, সামর্থের উপর ইহার হুকুম বিবিধ হতে পারে। এ জন্য দেখা যায়, মক্কী আয়াতসমূহ উৎসাহিত করেছে কাফিদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে এবং যুদ্ধে ক্ষমা প্রদর্শন করতে। কারণ, তখন মুসলিমগণ সংখ্যায় ও শক্তিতে দুর্বল ছিল। আর মাদানী আয়াতে বলা হয়েছে ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে, যখন মুসলিমদের শক্তি বেড়েছে। তাই এটা নির্ভর করে মুসলিমদের সার্বিক অবস্থার উপর।

মক্কার জীবনে আল্লাহ তাআলা জিহাদের হুকুম দিয়েছেন কোরআন দ্বারা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا ﴾ الفرقان: ٥٢

আর (কুরআন) দ্বারা তাদের সাথে বড় জিহাদ করুন। (সূরা ফুরকান, ৫২)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ الشورى: ٤١

নিশ্চয় যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। (সূরা শূরা, ৪১)

এগুলোর উপর নির্ভর করে বলা চলে জিহাদের শ্রেণী হল চারটি।

১। শয়তানের সাথে জিহাদ।

২। নফসের সাথে জিহাদ।

৩। কাফিরদের সাথে জিহাদ।

৪। মুনাফিকদের সাথে জিহাদ।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কেন জিহাদ প্রচলন করেছেন ?

উত্তরঃ বিভিন্ন কারণে আল্লাহ তাআলা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হুকুম করেছেন,

তম্মধ্যে আছেঃ
১। শিরক ও মুশরিকদের প্রতিহত করতে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা কখনই শিরক পছন্দ করেন না।
২। আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করার জন্য।
৩। সমস্ত ধরণের বিপদাপদ হতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস-কে রক্ষা করার জন্য।
৪। মুসলিমদের ও তাদের দেশসমূহের হিফাজত করার জন্য।
প্রশ্নঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের হুকুম কি ?
উত্তরঃ সাধ্য অনুযায়ী জান-মাল ও বাকশক্তি দ্বারা জিহাদ করা সকলের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ﴾ التوبة: ٤١

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও ভারী ও অথবা হাল্কা অবস্থায়। আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর তোমাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা। (সূরা তাওবাহ্ ৪১)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর তোমাদের সাধ্যমতে জান-মাল ও বাকশক্তি দ্বারা। (বর্ণনায় আবুদাউদ)
প্রশ্নঃ মু'মিনদের জন্য বন্ধুত্ব কি?
উত্তরঃ বন্ধুত্ব হচ্ছে অন্যান্য মু'মিন ও একত্ববাদীদের ভালবাসা ও সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ ﴿٧١﴾ ﴾ التوبة: ٧١

মু'মিন পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের বন্ধু স্বরূপ। (সূরা তাওবাহ্ ৭১)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا . رواه مسلم

একজন মু'মিনের সাথে অন্য মু'মিনের সম্পর্ক হচ্ছে, দেয়াল কিম্বা ইমারতের গাথুনির মত যা একে অপরকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। (বর্ণনায় মুসলিম)
প্রশ্নঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের সাহায্য করা কি জায়েয ?
উত্তরঃ না, উহা জায়েয নয়। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ﴾ المائدة: ٥١

আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই দলে। (সূরা মায়িদাহ, ৫১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয় আমার বংশের অমুক আমার বন্ধু নয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ কিভাবে মুসলিমগণ বিচার করবে?

উত্তরঃ মুসলিমগণ বিচার করবে কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ المائدة: ٤٩

আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনে বিচার করুন। (সূরা মায়িদাহ ৪৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তারপর ওহে মানুষেরা ! আমিও মানুষ। যে কোন সময় আমার রবের প্রতিনিধি আসবে (আমাকে নিতে) সাথে সাথে আমি তার সাথে চলে যাব আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে আছে হিদায়েত ও নূর (পথ প্রদর্শন)। তাই আল্লহর কিতাবকে আঁকড়ে ধর। তারপর কোরআনের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত কর। তারপর বলেনঃ আর আমার বংশধর। (বর্ণনায় মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেনঃ

تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله. رواه مالك(

আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তাদের আঁকড়ে ধর, তবে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত। (বর্ণনায় মুয়াত্তা মালেক)

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা কোরআন কেন অবতীর্ণ করেছেন ?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা কোরআন অতীর্ণ করেছেন, উহার মাধ্যে যা কিছু আছে তা অনুসরণ করার জন্য ও সে অনুযায়ী তা কর্মে বাস্তবায়ন করার জন্য। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ الأعراف: ٣

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ হতে যা অতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ কর। (সূরা আ'রাফ, ৩)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোরআনকে তিলাওয়াত কর, আর সে অনুযায়ী কাজ কর। তার দ্বারা খাওয়া পরার ব্যবস্থা কর না। (বর্ণনায় আহমদ)
প্রশ্নঃ কোরআন মানুষের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস ব্যাখ্যা করেছে?
উত্তরঃ উহা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বর্ণনা। যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আর মুশরিকরা যে তাদের আউলিয়াদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে, মানুষেরা যেন তার বিরুদ্ধাচরণ করে।
আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে বলতে বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ ﴾ الجن: ٢٠

হে নবী বলুন, নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি, আর তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করি না। (সূরা জিন, ২০)
প্রশ্নঃ কেন আমরা কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত করি ?
উত্তরঃ আমরা এ জন্য কোরআন পাঠ করি যাতে বুঝতে পারি, চিন্তাভাবনা করতে পারি এবং তার উপর আমল করতে পারি।
আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾ ﴾ ص: ٢٩

আমি আপনার নিকট যে কিতাবকে অতীর্ণ করেছি তা বরকতময়, যাতে করে মানুষেরা তার আয়াতসমূহকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। আর বুদ্ধিমানগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (সুরা সোয়াদ, ২৯)
আলী (রাঃ) হতে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে - যদিও অর্থের দিক দিয়ে সহীহ- তিনি বলেনঃ ওহে নিশ্চয় নানা ধরণের ফিৎনা হবে। বললামঃ এর থেকে বাঁচাঁর উপায় কি ? তিনি বললেনঃ আল্লহর কিতাব! তাতে আছে তোমাদের পূর্বের যুগের সংবাদ এবং পরের যুগের খবর। আর নিজেদের মধ্যে কিভাবে বিচার করবে তাও তাতে আছে। উহা কোন জিনিসকে নির্দিষ্ট করে। উহা কোন কবিতা কাহিনী নয়। কোন শক্তিশালী ব্যক্তিও যদি উহাকে পরিত্যাগ করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি কোরআনকে ত্যাগ করে অন্যত্র হিদায়েত খোজেঁ, আল্লাহ্ তাআলা তাকে

গোমরাহ করবেন। উহাতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার দেয়া সঠিক পথ-নির্দেশ। উহা হচ্ছে হিকমতে পূর্ণ। উহাই হচ্ছে সঠিক পথ। উহার বিধান অনুযায়ী চললে নফসের গোমরাহি ও মুখের কথার ক্ষতি হতে বাঁচা যায়।
উহা পাঠ করে ওলামারা কখনও পূর্ণ তৃপ্ত হয় না, আকাংখা থেকেই যায়। বারে বারে তিলাওয়াত করলেও উহা পুরাতন হয় না। তার সুন্দর সুন্দর কথাগুলোর স্বাদ কখনও শেষ হয় না। উহা শ্রবণ করে জিনরা পর্যন্ত বলে উঠেঃ

﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۝١ ﴾ الجن: ١

নিশ্চয় আমরা বড়ই আশ্চর্য্য কোরআন শ্রবণ করেছি। (সূরা জিন, ১)
কোরআন অনুযায়ী যে কথা বলবে, সে সত্যবাদী। যে উহা অনুযায়ী বিচার করবে, সে ন্যায় বিচারকারী। আর যে উহার উপর আমল করবে, সে উত্তম প্রতিদান পাবে। যে তাঁর দিকে ডাকবে, সে সঠিক রাস্তায় হিদায়েত পাবে।

প্রশ্নঃ কোরআন কি জীবিতদের জন্য, নাকি মৃতদের জন্য ?
উত্তরঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোরআনকে জীবিতদের জন্য নাযিল করেছেন যাতে তারা জীবিতাবস্থায় উহা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে সঠিক রাস্তায় চলা ও নেক আমল করতে পারে। উহা মৃতদের জন্য নয়। কারণ তাদের আমলসমূহ বন্ধ হয়ে যায় তাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই। না তারা মৃত্যুর পর উহা পড়তে পারে, আর না পারে আমল করতে। অন্যরা তিলাওয়াত করলে তা তার নিকট পৌঁছাবে না, একমাত্র তার সন্তানের পাঠকরা ব্যতীত। কারণ সন্তান তার নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন।
আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٧٠ ﴾ يس: ٧٠

যারা জীবিত তাদের যাতে ভয় প্রদর্শন করা যায়। আর কাফিরদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা ঘটেই। (সূরা ইয়াসিন, ৭০)
আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩ ﴾ النجم: ٣٩

মানুষ নিজে যা উপার্জন করেছে উহা ছাড়া কিছুই পাবে না। (সূরা নজম, ৩৯)
এই আয়াত হতে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) হুকুম বের করেছেন যে, কুরআন তেলাওয়াত করে তার সাওয়াব মৃতদের জন্য বখশিস করে দিলে উহা তাদের কাছে পৌঁছবে না।

কারণ উহা তার আমলও না উপার্জন। (তফসির ইবনে কাসীর)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم

যখন কেহ মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতিক্রম ছাড়া। সদকায়ে জারিয়া, ঐ ইলম যার দ্বারা মানুষ দ্বীনি উপকার পায়, আর ঐ নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করবে। (বর্ণনায় মুসলিম)
আর কোন বিনিময় ছাড়া যে দু'আ বা সাদাকাহ্ মৃতদের জন্য করা হয়, তা উহাদের নিকট পৌছেঁনোর ব্যাপারে কোরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল আছে। (তফসীর ইবনে কাসীর)
প্রশ্নঃ সহীহ হাদীসের উপর আমল করার হুকুম কি?
উত্তরঃ সহীহ হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴿٧﴾ ﴾ الحشر: ٧

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদের করতে বলেন তাকে আঁকড়ে ধর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থেক। (সূরা হাশর,৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها .رواه احمد

তোমদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। (বর্ণনায় আহমদ)
প্রশ্নঃ হাদীস ব্যতীত কোরআন কি একাই যথেষ্ট ?
উত্তরঃ হাদীস হল কোরআনের পরিপূরক। হাদীস ব্যতীত কোরআন একাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ النحل: ٤٤

আর আমি আপনার নিকট এই কোরআনকে এ জন্য প্রেরণ করেছি যাতে তাকে মানুষের নিকট ব্যাখ্যা করতে পারেন ঐ সমস্ত কথা, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে করে তারা সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। (সূরা নাহাল, ৪৪)

প্রশ্নঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার বিপরীতে কি আমরা কথা বলব?

উত্তরঃ না, তাদের কথার উপর আমরা কোন কথা বলব না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١ ﴾ الحجرات: ١

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের কথার উপর কথা বল না। (সূরা হুজরাত, ১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق .رواه احمد

স্রষ্টার সাথে পাপের ব্যাপারে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। (বর্ণনায় আহমদ)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমার ভয় হয়, তোমাদের উপর আসমান হতে (আজাবের) পাথর বর্ষিত হবে। আমি বলছি, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বল আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ) বলেছেন।

প্রশ্নঃ কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচার করার হুকুম কি ?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে ওয়াজিব। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾ النساء: ٦٥

না, তোমরা রবের কসম ! তারা কক্ষণই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয়, তার বিচারের ভার তোমার উপর অর্পন না করে। তারপর তুমি যে বিচার করবে উহার ব্যাপারে অন্তরে কোন কষ্ট পাবে না এবং তাকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবে। (সূরা নিসা, ৬৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

ومن لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجة

যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাসকগণ আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবে না এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে কম বেশী করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা

তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়ে রাখবেন। (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

প্রশ্নঃ যদি আমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আমরা কি করব ?

উত্তরঃ তখন আমরা কোরআন ও সহীহ হদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ النساء: ٥٩

যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তবে উহার বিচারের ভার আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস করে থাক। উহাই হচ্ছে উত্তম ও সুন্দর ব্যাখ্যা। (সূরা নিসা, ৫৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك

তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তাদের আকড়ে ধর, তবে কক্ষণই পথভ্রষ্ট হবে না। উহা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত। (বর্ণনায় মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, শরীয়তের আদেশ ও নিষেধাবলী মান্য করা জরুরী নয়, তার সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম কি ?

উত্তরঃ তার হুকুম হল। সে কাফির, মুরতাদ। ইসলাম হতে সে বের হয়ে গেছে। কারণ, দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। তার বুঝ পাওয়া যায় কালেমার স্বাক্ষীর মাধ্যে। আর বহ্যিকভাবে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত করা হয় তখন। এর মধ্যে আছেঃ আক্বীদার মূলনীতি সমূহ, ইবাদতের নিদের্শন সমূহ, শরীয়ত মত বিচার করা ইত্যাদি। আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহপাক প্রদত্ত নিয়ামাবলীকে মেনে চলতে হবে। আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হুকুম ছাড়া অন্য কোন আইনের মাধ্যমে যদি হালাল হারাম সাব্যস্ত করা হয় তবে তা এক শ্রেণীর শিরক বলে গণ্য হবে। উহা ইবাদতের মধ্যে শিরক থেকে কোন অংশে কম নয়।

প্রশ্নঃ কিভাবে আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসব ?

উত্তরঃ তাদেঁরকে ভালবাসব তাদেঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। সাথে সাথে তাদের হুকুমাবলী পালনের মাধ্যমে

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ ﴾ آل عمران: ٣١

হে নবী আপনি বলুন ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন, আর তোমাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ খুবই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আল-ইমরান. ৩১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (متفق عليه)

তোমাদের কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান ও অন্যান্য সমস্ত মানুষদের হতে অধিক প্রিয় না হইব। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালবাসার শর্ত কি কি ?

উত্তরঃ এই শর্ত অনেক, তম্মধ্যে আছে :

তাঁরা যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন ঐ সমস্ত জিনিসকেও ভালবাসা।

২। তাঁরা যা অপছন্দ করেন অথবা যাতে রাগান্বিত হন তা হতে বিরত থাকা।

৩। তাঁরা যা ভালবাসেন তাকে ভালবাসা আর তাদেঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা।

৪। যারা তাদের বন্ধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, আর যারা শত্রু তাদের সাথে শত্রুতা করা।

৫। তাদেঁরকে যারা মান্য করে সর্বদা তাদের সাহায্য করতে তৎপর হওয়া, আর তাদের প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা করা। আর যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা যে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার দাবী করে তা মিথ্যার শামিল। এ সম্বন্ধে কবি বলেনঃ যদি তোমার ভালাবাসা সত্যই হত তবে

অবশ্যই তার আনুগত্য করতে। কারণ, যে যাকে ভালবাসে, সে তার আনুগত্য করে।
প্রশ্নঃ ভয়ের সাথে ও অবনত হয়ে কাকে ভালবাসতে হয়?
উত্তরঃ এই ধরণের ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই হতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ ﴿١٦٥﴾ ﴾ البقرة: ١٦٥

এবং মানুষের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানিয়ে নেয়, আর তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মতই। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের সর্বোচ্চ ভালবাসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। (সূরা বাক্বারাহ্ ১৬৫)

সুন্নাত ও বিদআত

প্রশ্নঃ দ্বীনের মধ্যে কি বিদাআতে হাসানাহ্ বলে কিছু আছে ?
উত্তরঃ না, দ্বীনের মধ্যে বিদআতে হাসানাহ্ বলে কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ ﴿٣﴾ ﴾ المائدة: ٣

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আর আমার নিয়ামতসমূহকেও পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন হিসাবে নির্দিষ্ট করে রাজী হয়ে গেলাম। (সূরা মায়িদাহ্ , ৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار. (رواه ابوداؤد و الترمذي حسن صحيح)

তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থেক, কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই গোমরাহি। আর প্রতিটি গোমরাহির ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।

(বর্ণনায় আবুদাউদ, তিরমিযি,হাসান সহিহ।

প্রশ্নঃ দ্বীনের মধ্যে বিদআত কি ?

উত্তরঃ দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হচ্ছে ঐ সমস্ত আমল যাতে শরিয়তের কোন হুকুম বা দলীল নেই।

আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের বিদআত সমূহকে অস্বীকার করে বলেনঃ

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ﴿٢١﴾ ﴾ الشورى: ٢١

তাদের কি এমন শরিক আছে যারা দ্বীনের মধ্যে এমন সব জিনিসের প্রবর্তন করেছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ অনুমতি দেননি। (সূরা শুরা, ২১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (متفق عليه)

যারা আমাদের হুকুম সমূহের মধ্যে নতুন কোন জিনিস প্রবর্তন করবে যা আমাদের দ্বারা প্রবর্তিত নয়, তা বাতিল। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ বিদা'আতের শ্রেণী বিভাগ কি কি ?

উত্তরঃ উহার নানা ভাগ আছে, তম্মধ্যে-

১। কুফরী বিদআতঃ মৃতদের নিকট অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট দু'আ করা কিংবা তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। যেমন লোকেরা বলেঃ হে আব্দুল কাদের জিলানী, আমাকে সাহায্য কর।

২। হারাম বিদআতঃ আল্লাহর নিকট কোন মৃতদের অসিলা করে সাহায্য চাওয়া, কবরের দিকে সালাত আদায় করা, তাদের মানত দেয়া, কবরের উপর গুম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি।

৩। মাকরুহ বিদআতঃ যেমন জুমআর সালাত আদায় করার পর জোহরের সালাত আদায় করা, আযানের পূর্বে ও পরে জোরে জোরে সালাত ও সালাম (দরুদ) পাঠ করা ইত্যাদি। নিয়ম হল, আজানের পর মনে মনে দরূদ (দু'আ)পড়া।

প্রশ্নঃ ইসলামে কি সুন্নাতে হাসানাহ্ (উত্তম সুন্নাত) বলে কিছু আছে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, যেমন কোন ভাল কাজে অগ্রগামী হওয়া। যেমনঃ দান করতে অগ্রগামী হওয়া যাতে অন্যেরাও তাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ الفرقان: ٧٤

আর আমাদের মুত্তকীদের ইমাম নিযুক্ত করুন। (সূরা ফুরক্বান,৭৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম সুন্নত প্রবর্তন করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরেও যারা ঐ আমল করবে তাদের প্রতিদানও সে পাবে। তবে পরে যারা উহা 'আমল করবে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ সত্যিকারের দুনিয়ার বৈরাগ্য কি ?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে মুসলিমগণ দুনিয়ার অর্জনকে তার মূল লক্ষ্য স্থির করবে না। অথবা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেবে না। আর দুনিয়ার উপার্জনে অহংকার কিংবা বেশী লোভ করবে না। বরঞ্চ তার কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং আখিরাতের ব্যাপারে কর্ম তৎপর হওয়া। এর মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমস্ত কিছুই শামিল হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্ ও তার বান্দাদের সাথে উত্তম ব্যবহারও অন্তর্ভূক্ত হবে।

যুহদ (বৈরাগ্য) মানে এ নয় যে, সমস্ত কাজ কর্ম ত্যাগ করে দুনিয়ার সবকিছু হতে নিজেকে নিবৃত্ত রেখে দরবেশদের মত জীবন অতিবাহিত করবে। উহাতে মূর্তিপূজকদের কিছুটা চিত্র ফটে উঠে। এজন্য ইহাকে যুহদ না বলে ভীরুতা বলা যেতে পারে। উহা অন্তরের দুর্বলতা আর সুপ্ত ক্ষমতার ও মনুষ্য শক্তিরও বিলোপও বটে। উহা হচ্ছে, সুফী পীরদের অধম বিদআতী সংস্করণ। এর ফলেই মুসলিমগণ সাহাবীদের যুগে মুসলিমদের মত সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে। ফলে, তারা তাদের ধর্ম ও মিশনকে অন্য জাতির নিকট পৌছাতে সমর্থ হয় না। এমনকি উল্টো কাফিররা তাদের দেশে যুদ্ধ করতে আসে, তাদের সম্পদ দখল করে এবং তাদের টুকরা টুকরা করে ফেলে।

প্রশ্নঃ তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরনের হুকুম কি ?

উত্তরঃ আক্বীদা ও তাওহীদের ক্ষেত্রে তকলীদ করা জায়েয নয়। বরং ওয়াজিব হল,

দ্বীনকে ঐ ভাবে বুঝাতে হবে যেমন ভাবে রাসূলদের (আঃ) উপর উহা অবতীর্ণ হয়েছে। আর কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ মতে চলতে হবে। সাথে সাথে সালাফে সালেহীনগণ যেমণ ভাবে বুঝেছেন তেমনি ভাবে আক্বীদার মাসআলাগুলো গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার। তবে ফিকহর ক্ষেত্রে যে কোন এক মাজহাব গ্রহণ করা জায়েয। তবে যে কোন মাজাহাবকে অনুসরণ না করলে তার জন্য জায়েয হবে না সমস্ত মাজহাব থেকে শুধু সহজ জিনিসগুলোকে খুজে বের করে আমল করা।(১) যখন মাজহাবের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আলেমদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস থেকে যথা সম্ভব খোঁজ করে দলিল প্রমাণ সহ আমল করা।

শরীয়তী ইলম শিক্ষা করা এবং

বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইলম শিক্ষার হুকুম

প্রশ্নঃ শরিয়তের ইলম এবং নব আবিষ্কার উপকারী ইলম শিক্ষার হুকুম কি ?

উত্তরঃ শরিয়তের ইলম দু ভাগে বিভক্ত।

প্রথমতঃ এমন ইলম শিক্ষা করা যা ব্যতীত আক্বীদা ও ইবাদত সহীহ হবে না। উহা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরযে আইন।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সুক্ষ্ম জিনিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা।

যেমন ফারায়েযের ইলম, সূক্ষ্ম হুকুম আহকাম, উসূলে ফিকহ, হাদীসের উসূল ইত্যাদি। ইহা ফরযে কেফায়াহ। যদি কিছু সংখ্যক আলেম এটা শিক্ষা করেন, তবে অন্যদের উপর আর ইহা ফরয থাকে না।

আর কোন শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা, জরুরী আবিষ্কার ইত্যাদির ইলম শিক্ষা করা ফরজে কেফায়াহ। যদি কোন নির্দিষ্ট মুসলিমের জন্য ইহা শিক্ষা করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তার উপর ইহা শিক্ষা করা ওয়াজিব।

শাসকগণ ইচ্ছা করলে এই ধরনের লোকদের উক্ত শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। যারা কোন আবিষ্কার, উদ্ভাবন জানা সত্বেও উহা বাস্তবায়ন করতে রাজী নয়, মুসলিম শাসকগণ তাদের জন্য অন্য কার্য নিষিদ্ধ করে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন।

আর বাইতুল মাল হতে টাকা খরচ করে হলেও তাদের উৎসহিত করা প্রয়োজন। আর প্রতিটি মুসলিম কর্মীর জন্য নব নব আবিষ্কারের চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন। প্রতিটি পদার্থকে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা দরকার। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশকে সামনে রেখে দ্বীনকে সম্মানীয় মর্যদায় উন্নীত করতে ও মুসলিমদের শান বাড়াতে আর আল্লাহ তাআলার কালেমাকে দুনিয়াতে উঁচু করতে এবং শত্রুদের নির্মূল করতে তৎপর হওয়া উচিত।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া ও আরবদের করণীয় ওয়াজিব সমূহ

প্রশ্নঃ আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও ইসলামের উপর আমলের হুকুম কি ?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে ঐ সমস্ত মুসলিমদের কর্তব্য যারা আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতকে ওয়ারিস হিসাবে পেয়েছেন। সাধারণভাবে প্রতিটি মুসলিমের উপরই দাওয়াতের কাজ করা জরুরী। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴿١٢٥﴾ ﴾ النحل: ١٢٥

তুমি তোমার রবের দিকে ডাক হিকমতের সাথে এ উত্তমভাবে উপদেশের মাধ্যমে। (সূরা নাহল, ১২৫)অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ﴿٧٨﴾ ﴾ الحج: ٧٨

আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাক, যথাযথ জিহাদ। (সূরা হাজ, ৭৮)

তাই প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের সাধ্যমত সব ধরনের জিহাদে শরিক হওয়া। বিশেষ করে, বর্তমান যামানায় ইসলামের জন্য আমল করাটা প্রতিটি মুসলিমের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করাও জরুরী। যদি কেহ তার সামর্থ থাকা সত্বেও এই হককে পুরোপুরি পালন করতে সচষ্ট না হয় তবে সে আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে অবহেলা করল।

প্রশ্নঃ মানুষের জন্য এটাই কি যথেষ্ট যে, সে শুধুমাত্র নিজেরই সংশোধন করবে ?

উত্তরঃ প্রথমে অবশ্যই নিজের সংশোধন করতে হবে। তারপর অন্যের সংশোধনের তৎপর হতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ ﴾ آل عمران: ١٠٤

আর তোমাদের মধ্যে একদল এমন হবে যারা (মানুষদের) কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর তারাই হচ্ছে কামিয়াব। (সূরা আল ইমরান, ১০৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন খারাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেন অবশ্যই প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও তা করতে বাধা দেয়। যদি তা না পারে, তবে যেন মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করে। আর যদি তাও না পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। উহাই হচ্ছে সর্বনিম্ন ঈমান। (বর্ণনায় মুসলিম)

প্রশ্নঃ আরবদের উপর ওয়াজিব কি ?

উত্তরঃ আরবরাই ইসলামের রিসালাতের বাহক। কারণ, কোরআন তাদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তারা ইসলাম সম্মত ভাবে চলে, তবে তারাই হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ কর্তৃক বাছাই করা হয়েছে।

তাই, সমস্ত আরবদের উপর ওয়াজিবসমূহ হচ্ছেঃ

১। ইসলামকে আক্বীদা, ইবাদত, শরীয়ত, হুকুমতসহ সমস্ত দিক দিয়েই গ্রহণ করবে। আর সাথে সাথে অন্যা জাতিদেরকেও ইসলামে দিকে দাওয়াত দেবে।

২। তারা কক্ষণো ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সামন্তবাদ, কমিউনিজম বা মার্কসবাদ, ইয়াহুদীবাদ অথবা এই জাতীয় অন্য কোন ধ্বংসকারী মতবাদ, যা ইসলামের পরিপন্থী, তাকে গ্রহণ করবে না। অথবা এই জাতীয় গোপনীয় কোন চিন্তাকে অন্তরে স্থান দেবে না। আর দেশ ও বস্তুকে সমস্ত কিছুর উপর প্রাধান্য দেবে। এতে যদি সে দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিবেচিত হয় তবুও তার পরিণাম বড়ই উত্তম। অন্য দিকে উহাকে পরিত্যাগ করা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। সে তার রবের রিসালাতকে ত্যাগকারী বলে গণ্য হবে, আর অন্য উম্মতদের চালনা করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হল। সাথে সাথে সে অন্য মুসলিমদের ভালবাসা হতেও বঞ্চিত হবে। তাদের সাথে রূহানী বন্ধন, যাহা পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্রিত করে তা হতেও বঞ্চিত।

তখন অন্যান্য দেশের লোকেরা আরবদের সম্বন্ধে নানারূপ বাজে ও আপত্তিকর কথা রটাবে, আর চেষ্টা করবে অন্য আরবদের ক্ষতি সাধন করতে। এমনিভাবে অন্যান্য জাতির নিকট তাদের যে একটি সম্মানীত স্থান রয়েছে, তা নষ্ট হয়ে যাবে। সাথে সাথে রূহানী বন্ধন কমতে থাকবে। আর এমনিভাবেই লক্ষ কোটি মুসলিমদের নিকট হতে দূরে সরে গিয়ে মাত্র কিছু সংখ্যক নিকৃষ্ট লোকের নিকট ভালবাসার পাত্র হবে।

প্রশ্নঃ জীবনের সত্যিকার রাস্তা কি ?

উত্তরঃ উহা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলা। যাকে আল্লাহ তাআলা ওয়াজিব করেছেন। যার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ জীবন যাপন করেছেন। ইসলামকে আমরা সহীহ ভাবে গ্রহণ করব, রুহানী দিক দিয়ে এবং শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা উহাকে আঁকড়ে ধরে উদাহরণ সৃষ্টি করব। যারা ইসলাম হতে দূরে সরে যাবে তাদের রাস্তা আমরা গ্রহণ করব না। দেশ বা বস্তুর উন্নতির নামে যা উপনিবেশবাদীরা আমাদের সামনে রেখেছে তাকে প্রাধান্য দেব না। আমরা ইসলামের শিক্ষা হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুৎ হব না। অন্য কোন উদ্দেশ্যে কারো সাথে শত্রুতা বা বন্ধুত্ব করব না। বরং অন্যান্য মুসলিম ভাই, সে দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে সাহায্য করব। যেন আমরা একই গাঁথার গাথুনি। আর যারা মুসলিমদের অপমানিত অপদস্থ করবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াব। আর এভাবেই তাদের দুঃখে আমরা দুঃখিত হব এবং তাদের বিপদ দূর করতে সচেষ্ট হব। আমরা সর্বদাই ইখলাসের সাথে চেষ্টা করব দ্বীনের ভিতর হতে সব ধরণের বিদআতকে বের করতে। আরও সচেষ্ট হবো, যাতে নানা রকম মতভেদকে দূর করে এক করতে পারি। যা রাজনীতির কারণে উদ্ভব হয়েছে। দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিকোণে এক হব না। আর যারা ইংরেজদের পোষ্য পুত্র, তারা আমাদের দ্বীন ও ইসলামী আইন সম্বন্ধে যতই বক্রোক্তিও আজে বাজে কথা বলুক না কেন, তাতে ভ্রুক্ষেপও করব না। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের ধ্বংস করা। আর যদি তাদের কথা মত চলি ও তাদের খুশি করতে ইসলামের হুকুমে অবহেলা করি, তবে তা সত্যিই আমাদের জন্য অবনতির কারণ হবে। কেননা, উহা আমাদের বস্তুর পূঁজারী বানিয়ে ছাড়বে। আর তাদের এই সমস্ত প্রচার প্রচারনাকে আমরা কখনো দূর করতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

তাই আল্লাহর কসম ! মুসলিম জাতি, বিশেষ করে আরবদের জন্য এই জাতীয় পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা কখনই উত্তম হবে না। কারণ, ইউরোপে যে বস্তুর

উন্নতি চলছে তাতে মুসলিমদের সম্মান নেই। তাদের যে মিশন, তার সাথেও ইসলামী আদর্শের মিল নেই। বরং, উহাদের মত চললে, মুসলিমগণ যে আল্লাহর রাস্তার শিক্ষক, যারা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়েতকে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে তা হতে বাদ পড়ে যাবে। বরং তখন তারা ঐ সমস্ত লোকদের পোষ্য বনে যাবে। আর তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে দুনিয়ায় ছড়াবে। এভাবে আস্তে আস্তে অন্য জাতিদের মধ্যে তাদের মর্যাদার স্থান নষ্ট হয়ে যাবে আর তাদের বিশেষত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এইভাবেই ঐ সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ জাতির সাথে মিলে মিশে আল্লাহ্ যে তাদের সর্বোত্তম বলেছেন, সেই সর্বোৎকৃষ্টতা নষ্ট করে ফেলবে।

এই সমস্ত কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তাদের পোষাক পরিচ্ছেদ, চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও নিদর্শন সমূহকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন যাতে করে আমরা অধঃপতনের মধ্যে পতিত না হই।

অতীত ও বর্তমানের জাহেলিয়াত

প্রশ্নঃ জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা কি শুধুমাত্র পূর্বের যুগে ছিল, নাকি প্রত্যেক যুগে নানা রূপে দেখা দেয় ?

উত্তরঃ উহা শুধু পূর্বেই ছিল না, বরং বর্তমানে এবং প্রতি শতাব্দীতে উহা বেড়েই চলেছে। উহাদের কতকগুলো নির্দিষ্ট রূপরেখা আছে। যা দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা চলে। প্রতিটি জাত, যারা তাদের রবের, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের নফসানিয়াত অনুযায়ী সর্ব কর্ম পালন করে তারাই জাহেল। এমনকি বর্তমান সময়ে যে অজ্ঞতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা আগের জামানার সর্বকালের জাহিলিয়াত হতে বেশী ভয়ংকর। কারণ, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে নিয়ামতের সাথে কুফরি করার প্রবণতা, স্রষ্টাকে অস্বীকার করা, অথবা তার সম্মানকে অপমানিত করা। অশ্লীলতা, নগ্নতা, পাপের কার্যসমূহ পেয়েছে সুন্দর উপমা। মানুষের নিকট হতে আত্ম সম্ভ্রম, লজ্জা এমনভাবে দুরীভূত হয়েছে যা আবু জাহেল, আবু লাহাব বা তাদের পূর্বের যুগের কাফিররা পর্যন্ত চিন্তা করতে পারেনি। আর অবস্থা এখানেই দাড়িয়ে থাকবে না। বরং মানুষেরা যতই আল্লাহর সীমারেখাকে লঙ্ঘন করতে থাকবে ও তার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকবে ততই তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে থাকবে। এটা তখনই বন্ধ হবে, যখন তারা তার

হুকুম মানতে থাকবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা ও রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনা করবে।

সমাপ্ত